সমুদ্র পরিচয়

প্রসাদ সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

সমুদ্র পরিচয়

প্রসাদ সেনগুপ্ত
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SAMUDRA PARICHAY
[Oceanography]
Prasad Sengupta

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল),
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : প্রদীপ সাহা

মূল্য : আট টাকা

Published by Dr. Ladli Mohon Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) New Delhi.

ভূমিকা

এই পুস্তিকার মূল লক্ষ্য তা'র নামেই স্পষ্ট। তবু কিছু বলবার আছে। পরিচয়ের বিস্তৃতি বা গভীরতা নিয়ে কারও হয়তো কোনো অসন্তোষ থাকতে পারে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে আপস না-ক'রে পারা যায়নি। সমুদ্র-বিজ্ঞান এখন বিস্তৃত এবং গভীর—দুইই; যথার্থই সমুদ্রতুল্য। তা'র উপরে কেবল একবার চোখ বুলিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। তা'ও আবার জায়গা বুঝে চোখ বন্ধ ক'রে থাকতেও হয়েছে। দু'টি বিষয় পরিপূর্ণভাবেই বাদ দিয়েছি ঃ সমুদ্রের আবহাওয়া এবং সমুদ্রের প্রাণী। এই দু'টি বিষয় স্বতন্ত্র বইতে আলোচিত হওয়া উচিত। সমুদ্রদূষণ বিষয়ে আলোচনাও বাদ দেবার পরিকল্পনা ছিল। শেষ পর্যন্ত 'পরিশিষ্ট-1'-এ এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে প্রকাশকের পরামর্শে। কিন্তু, এই আলোচনা অতি সরলীকৃত এবং কেবলমাত্র সার্বিক-নীতিভিত্তিক। সমুদ্রদূষণের আলোচনা বস্তুত পরিবেশদূষণের সামগ্রিক আলোচনার অংশ; স্বতন্ত্র আলোচনা নয়। এ ছাড়া, 'সমুদ্র নিয়ে রাজনীতি' এখনকার যুগে এক বিশেষ প্রাসঙ্গিক এবং আকর্ষণীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও এই পুস্তিকায় তা'কে বর্জন করা হয়েছে।

আপসের আরও একটি ক্ষেত্র আছে। পাঠক সাধারণের জন্য বিজ্ঞানের যে বই লেখা হয়, তা'তে তত্ত্ব ও তথ্যের ভার কতটা চাপানো উচিত—এ বিষয়ে সব লেখকেরই নিজস্ব মতামত থাকে। আমি আমার মতেই চলতে চেষ্টা করেছি, এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি প্রাসঙ্গিক বা অর্ধ-প্রাসঙ্গিক কাহিনীর এলাকায় আলোচনাকে টেনে নিতে, যা'তে পাঠক কম ক্লান্তি বোধ করেন। একটিমাত্র জায়গায় সামান্য গণিতের স্পর্শ আছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের কথা ভেবেই ওটি করা এবং অনুচ্চ স্তরের গণিতেই ওটি সীমিত। তবু কারও অসুবিধা হ'লে ওই অংশ তিনি বাদ দিয়ে যেতে পারেন।

পুস্তিকার শেষে নির্বাচিত বই ও প্রবন্ধের উল্লেখপঞ্জীও যুক্ত হ'ল প্রকাশকের আগ্রহে, যদিও এই তালিকা কম পাঠকেরই কাজে লাগবে। বর্তমানে সমুদ্র-বিজ্ঞানের জনপ্রিয় ইংরেজী বই অনেক আছে; কিন্তু, আমি এই ধরনের বই-এর সাহায্য খুব কমই নিয়েছি।

পরিশেষে, এই পুস্তিকার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। বহু বছর আগে রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকার পর পর দু'টি সংখ্যায় [26শে মার্চ, 2রা এপ্রিল, 1972] সমুদ্র বিষয়ে একটি আলোচনা করেছিলাম—যা'র সংক্ষিপ্ততায় অসন্তুষ্ট হয়ে সেটা বিস্তৃততর করার ইচ্ছা অনেক দিন ধ'রে পোষণ ক'রে এসেছি। বিস্তৃত করতে গিয়ে সেটা বস্তুত সম্পূর্ণ অন্য পরিকল্পনায় লেখা হ'ল, এবং এই পুস্তিকার শেষ পরিচ্ছেদের শেষাংশ বাদে বর্তমান আলোচনার সঙ্গে এর পূর্বসূরীর কোনো সম্পর্ক নেই। এ ছাড়া, 'সমুদ্রহত্যা' প্রবন্ধটি 'অন্বেষা' [মার্চ, 1985] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় অপরিবর্তিত রূপে।

কলকাতার 'আমেরিকান্ য়ুনিভার্সিটি সেণ্টার্'-এর গ্রন্থাগার থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। ঐ সংস্থার শ্রীসজলকুমার ভট্টাচার্য তথ্য সংগ্রহে আমার পরিশ্রম অনেক লাঘব ক'রে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপিতে আমার অসতর্কতার কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় [রসায়ন বিভাগ, বারাসত সরকারী মহাবিদ্যালয়]। শ্রীমানিকচন্দ্র দে নিরলস চেষ্টা করেছেন মুদ্রণ ত্রুটীহীন করতে। নিছক ধন্যবাদ এঁদের না-জানানোই শিষ্টাচার সম্মত হবে ব'লে মনে করি।

প্র. সেনগুপ্ত,
পদার্থবিদ্যা বিভাগ,
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ।

ঝাড়গ্রাম ;
নভেম্বর, 1986.

সূচীপত্র

এক

সাগর আর মহাসাগর ! যা'রা জুড়ে আছে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ। একেবারে সঠিক হিসাব দিতে হ'লে—শতকরা একাত্তর অংশ।* রহস্য ছড়ানো তা'র উন্মুক্ত তলে, জলের গভীরে, অন্ধকার তলদেশে !

বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুরু হয় সংজ্ঞা দিয়ে। সাগর আর মহাসাগরের সংজ্ঞা কি ? পাঠকের সুবিধাক্রমে, ঐ দু'টি শব্দের আলাদা সংজ্ঞা দূরে থাকুক, কোনোটিরই কোনো সংজ্ঞা নেই। 'সাগর' কা'কে বলব, তা'র কিছু ঠিক নেই। কত বড়ো সাগরকে 'মহাসাগর' বলব, তারও কোনো নিয়ম নেই। সাগরের ছোট সংস্করণ 'উপসাগর'. কতো বড়ো হওয়া সম্ভব, তা-ও কেউ বলে দেয়নি। ...বাস্তব উদাহরণে আসা যাক। পুঁচকে হ্রদ 'ডেড্‌সী' সাগরের মর্যাদা পেলো ; অথচ পেলো না তা'র ষাট গুণ বড়ো মিশিগান্ হ্রদ, আশিগুণ বড়ো সুপীরিয়র হ্রদ। তা'রা ঐ 'হ্রদ'ই রয়ে গেল ! বঙ্গোপসাগর অনেক সাগরের চেয়ে বড়ো ; তবুও সে 'উপসাগর' রয়ে গেল। এর কারণ অবশ্য মানচিত্র দেখলে খানিকটা বোঝা যায়। কিন্তু, একটি বিশাল মহাসাগরের বিস্তৃতির কেন্দ্রে একটি 'সাগর'-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা বাস্তবিকই শক্ত। উত্তর-আটলাণ্টিক মহাসাগরের ঠিক মাঝখানে 'সারগাসো সী' ঠিক এই রকম একটি কৌতুকময় অস্তিত্ব।...এখন আর এ সব ব্যাপারে করার কিছু নেই। প্রচলিত রীতি মেনে চলাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক। এই বইতে 'সাগর' এবং 'মহাসাগর' শব্দ দু'টির মধ্যেও সাধারণভাবে আমরা কোনো তফাত করব না। 'সাগরের জল' কিংবা 'সমুদ্রের মাছ' বলতে মহাসাগর এবং উপসাগর বাদ দিয়ে কেবল সাগরকেই বোঝাবে, তা' নয়।

মহাসাগরের বিভাগ নিয়ে কিন্তু একটা নতুন রীতি চালু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দিকে [1897]। আগে আমরা পাঁচটা মহাসাগরের অস্তিত্ব স্বীকার করতাম ঃ প্রশান্ত-(Pacific-), আটলাণ্টিক- (Atlantic-), ভারত-

---

* বলা বাহুল্য, দক্ষিণ গোলার্ধে সাগরের আধিপত্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। উত্তর গোলার্ধে জল এবং ডাঙার অনুপাত 61 ঃ 39, এবং দক্ষিণ গোলার্ধে এই অনুপাত 81 ঃ 19

(Indian-), উত্তর- (Arctic-) এবং দক্ষিণ মহাসাগর (Antarctic Ocean)। কিন্তু, উল্লিখিত সময় থেকে এই সংখ্যা ক'মে তিন-এ দাঁড়িয়ে যায় ; শেষোক্ত দু'টি মহাসাগরের আলাদা অস্তিত্ব আর স্বীকৃত হয় না। উত্তর মহাসাগর এখন আটলাণ্টিকের সংলগ্ন সাগর (merginal sea) হিসাবে গণ্য ; এবং দক্ষিণ মহাসাগরের এক-একটি অংশ এক-এক মহাসাগরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তা'কে তিন ভাগ করে। অবশ্য, তা' সত্ত্বেও আটলাণ্টিকের মর্যাদা দ্বিতীয় স্থানেই থেকে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরকে সে কোনোভাবেই পিছনে ফেলতে পারেনি, —কি গভীরতায়, কি বিস্তারে ! নীচের ছক্‌টিতে একবার নজর করলেই তিনটি মহাসাগরের বিস্তার, আয়তন এবং গড় গভীরতা সম্পর্কে ধারণা হবে। প্রত্যেক মহাসাগরের জন্য দু'রকমের হিসেব দেওয়া হ'ল ঃ সংলগ্ন সাগরগুলো যোগ ক'রে এবং না ক'রে। বিস্তার এবং আয়তনের স্তম্ভে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া হ'ল, তা'দের 10^6 বা দশ লক্ষ দিয়ে গুণ করলে আসল অঙ্কটি পাওয়া যাবে। পাঠকের সুবিধার জন্য দু'রকম একক ব্যবহার করা হয়েছে।

মহাসমুদ্র	বিস্তার ($\times 10^6$)		আয়তন ($\times 10^6$)		গড় গভীরতা	
	বর্গ কিলোমিটার	বর্গ মাইল	ঘন কিলোমিটার	ঘন মাইল	মিটার	ফুট
আটলাণ্টিক ঃ						
সংলগ্ন সাগর বাদে	82·5	31·8	324·6	77·9	3930	12890
সংলগ্ন সাগর সমেত	106·5	41·1	354·7	85·2	3330	10922
প্রশান্ত ঃ						
সংলগ্ন সাগর বাদে	165·3	63·8	707·6	169·9	4280	14038
সংলগ্ন সাগর সমেত	179·7	69·4	723·7	173·7	4030	13218
ভারত ঃ						
সংলগ্ন সাগর বাদে	73·5	28·4	291·0	69·9	3960	13037
সংলগ্ন সাগর সমেত	74·9	28·9	291·9	70·1	3900	12792
সমস্ত সাগর ও মহাসাগর একত্রে	361·1	139·4	1370	329	3790	12430

সমস্ত সাগর ও মহাসাগরের গড় গভীরতা 12430 ফুট, তা উপরের ছক্‌-এ উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এই গভীরতা পৃথিবীর উপরে (অর্থাৎ

ডাঙায়) সাগরতলের উপরে গড় উচ্চতার চেয়ে অনেক বেশী। পৃথিবীর সমস্ত ভূমিভাগের গড় উচ্চতা মাত্র 2760 ফুট বা 840 মিটার। যদি গভীরতম বিন্দুর সঙ্গে উচ্চতম বিন্দুর তুলনা করা হয় তা'হলেও সাগরের জিৎ। সমুদ্রের গভীরতম জায়গা প্রশান্ত মহাসাগরের 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ্' 35597 ফুট (10850 মিটার) গভীর। [এর অবস্থান ফিলিপাইন্-এর পূবে, গুয়াম্ (Guam) দ্বীপের কাছাকাছি জায়গায়।] আর উচ্চতম বিন্দু তো মাউণ্ট্ এভারেস্ট্—আমরা জানিই, যা'র উচ্চতা অনেক কম, মাত্র 29028 ফুট, বা 8848 মিটার।*

সমুদ্রের মোট বিস্তারের শতকরা কত অংশ কতখানি গভীর, সে হিসাবেও আমরা আগ্রহ দেখাতে পারি। নিচের ছক্‌টিতে আমরা এই হিসাব দেখিয়েছি। মহাসাগরের সর্বাধিক গভীরতাকে মোট ন'টি ভাগ করা হ'ল। প্রত্যেক গভীরতা কতখানি বিস্তার জুড়ে রয়েছে পাশাপাশি তা'ও দেখানো হ'ল। ছক্‌টি একবার দেখলেই এর বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

মহাসাগরের গভীরতা		মোট বিস্তারের কত শতাংশ
0—660 ফুট	(0—200 মিটার)	7·6
660—3300 ,,	(200—1000 ,,)	4·3
3300—6600 ,,	(1000—2000 ,,)	4·2
6600—9800 ,,	(2000—3000 ,,)	6·8
9800—13100 ,,	(3000—4000 ,,)	19·6
13100—16400 ,,	(4000—5000 ,,)	33·0
16400—19700 ,,	(5000—6000 ,,)	23·5
19700—23000 ,,	(6000—7000 ,,)	1·1
23000 ফুটের বেশী	(7000 মিটারের বেশী)	0·1

* মারিয়ানা ট্রেঞ্চ্-এর গভীরতম এই অংশটির নাম 'চ্যালেঞ্জার ডীপ্'—'চ্যালেঞ্জার' নামে একটি জাহাজ 1948 সালে এটা আবিষ্কার করেছিল, সেই সূবাদে। এই আবিষ্কারই এখনও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু, পরবর্তী কালে—1962 সালে—ব্রিটিশ জাহাজ 'কুক্' প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারে পশ্চিমে মিন্দানাও ট্রেঞ্চ্ (Mindanao Trench)-এ 11516 মিটার বা 37772 ফুট গভীর জায়গার সন্ধান পায় বলে জানা গেছে। কিন্তু, যে কোনোও কারণেই হোক, এই আবিষ্কার ব্যাপক স্বীকৃতি পায়নি এখনও।

গভীরতা এবং বিস্তারে এককভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রথম স্থান হলেও অন্য এক বিষয়ে সে আটলাণ্টিকের তুলনায় পিছিয়ে আছে। উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য আটলাণ্টিকের এতই বেশী যে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের মিলিত অঙ্কের চেয়েও তা' বেশী হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য অত্যধিক আঁকাবাঁকা চেহারার জন্যই আটলাণ্টিকের উপকূলের দৈর্ঘ্য এত বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

*　　　*　　　*

মহাসাগরের সবকিছু নিয়ে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। কেবলমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় নিয়েই আমরা নাড়াচাড়া করব। যে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং মূল্যবান প্রসঙ্গ আমরা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাদ দেব, তা' হচ্ছে সমুদ্রের প্রাণী। এ আলোচনা আলাদা বইতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে যে কয়েকটি বিষয়ে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দেব—তা'র ভিতরে মহাসাগরের তলদেশ, মহাসাগরের পর্বত, মহাসাগরীয় স্রোত এবং মহাসাগরের বিবর্তন অন্যতম। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে অন্য কিছু আলোচনাও বিক্ষিপ্তভাবে এসে যাবে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাগর এবং মহাসাগরের তলদেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য হাজির করা হচ্ছে।

দুই

সমুদ্রের তলার ছবিটা কেমন, তা' নিয়ে মানুষের দীর্ঘকালের কৌতূহল। খুব অগভীর সমুদ্রে মুক্তা, স্পঞ্জ্‌ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে ডুবুরিরা নীচে নেমেছে প্রাচীন কাল থেকেই, কিন্তু গভীর সমুদ্রের তলা সম্পর্কে মানুষের তখন কোনো ধারণা ছিল না। বলা বাহুল্য, প্রাথমিক কৌতূহল ছিল গভীরতা নিয়েই। সর্বপ্রথম কে কোথায় গভীরতা মাপেন, ঠিক জানা যায় না; তবে গভীরতা পরীক্ষার পুরোনো পদ্ধতি ছিল অতি সরল; বিরাট লম্বা দড়ির এক প্রান্তে একটা ভারি জিনিস বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া। তবে, রীতিমত ব্যাপক আয়োজনে গভীরতা মাপার প্রথম কার্যক্রম নেওয়া হয় 1840 সালে; দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরের কেন্দ্র অঞ্চলে, এবং ঐ সরল পদ্ধতিতেই। এক্ষেত্রে প্রায় তিন মাইল লম্বা দড়ি ব্যবহার করা হয়। সমুদ্রের তলার একটা সম্পূর্ণ মানচিত্র গ'ড়ে তোলার কাজে প্রাথমিক সাফল্য আসে 1895 খ্রীস্টাব্দে, মাত্র সাত হাজার

ছবি ঃ 1
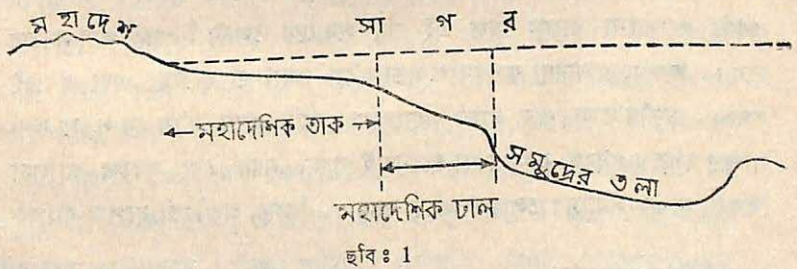
জায়গায় গভীরতা মাপার ভিত্তিতে। জলের ভিতরে শব্দ সৃষ্টি ক'রে তলা থেকে প্রতিফলিত তা'র প্রতিধ্বনি গ্রহণের ভিত্তিতে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হ'ল 1920 সালে, এবং গভীরতা মেপে মেপে সাগরের তলার মানচিত্র উদ্ধার করার সত্যিকার সাফল্য আসতে থাকে এই সময় থেকেই। সত্তরের দশকে এই মানচিত্র প্রায় নিখুঁতভাবে তৈরী হয়ে যায়, কেবল চিরতুষারময় অঞ্চলগুলো বাদ দিয়ে। এর পিছনে ছিল অজস্র জায়গায় কোটি কোটি বার ঐ পরীক্ষা করার ফলাফল। ইতিমধ্যে ফলিত বিজ্ঞানের অপূর্ব উন্নতিকে অন্যভাবেও কাজে লাগানো হয়ঃ যেমন, জলের ভিতরে ক্যামেরা নামিয়ে দিয়ে তলার জমির ফটো তুলে আনা,

দারুণ-চাপ-সইতে-পারা ঘরের মধ্যে ঢুকে সমুদ্রের তলায় নেমে সেখানকার দৃশ্য চাক্ষুস ক'রে আসা, ইত্যাদি। সমুদ্রের তলার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখন সম্পূর্ণ হ'য়ে না-থাকলেও যথেষ্ট অগ্রসর।

সমুদ্রের জলে ঢাকা সম্পূর্ণ জমিটাকেই কিন্তু সমুদ্রের 'তলা' (bottom বা floor) বলা হয় না। উপকূলে যেখান থেকে জল শুরু হ'ল সেখান থেকে মোটামুটি হাজার ফুট গভীরতা অবধি জমিটাকে বলা হয় Continental Shelf বা 'মহাদেশিক তাক'। হাজার থেকে দশ হাজার ফুট গভীরতার তলদেশকে বলে Continental Slope বা 'মহাদেশিক ঢাল'; এবং মহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে এইবারেই সমুদ্রের আসল তলদেশ শুরু হয়। অবশ্য, মাঝ-সমুদ্রে কখনও যদি গভীরতা দশ হাজার ফুটের কম দাঁড়িয়ে যায় (সেখানে কোনো উঁচু জায়গা থাকতেও পারে।), তা'হলেও সেটা কিন্তু সমুদ্রেরই তলা ; ঐ শ্রেণী-বিভাগ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (আগের পৃষ্ঠার ছবিতে এই শ্রেণী-বিভাগের ব্যাপারটি বোঝানো হয়েছে।)

সাগরের সত্যিকার 'তলা' বলতে আমরা যে অঞ্চলটা বুঝিয়েছি, সেই এলাকাও অতি বিশাল, পৃথিবীর মোট বিস্তারের অর্ধেকের বেশী। মানুষের একটা পুরোনো ধারণা ছিল এই যে, সমুদ্রের তলাটা নিশ্চয়ই খুব সমতল হবে। অবশ্য, এ ধারণা কতকাংশে সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, এবং হবারই কথা। সুদীর্ঘকাল ধরে নানা মহাদেশের মাটি ধুয়ে ধুয়ে যে সূক্ষ্ম কণা সাগরে ছড়িয়ে পড়ছে, নরম কাদা হয়ে তাই পুরু, নরম এবং সমতল গালিচা বিছিয়ে রাখবে সমুদ্রের তলায়—এটাই সম্ভব।* কিন্তু, গভীরতা মাপার ব্যাপক

---

* মহাসাগরের তলায় কী পরিমাণ বস্তু জমা হচ্ছে, তা'র একটা আন্দাজ এখানে দেওয়া যেতে পারে। নদীগুলো সাগরের বুকে কঠিন (অদ্রাব্য) পদার্থ, অর্থাৎ—পলি, ইত্যাদি ঢালছে বছরে দু' থেকে তিন হাজার কোটি টন ; এবং দ্রবণীয় পদার্থ (লবণ, ইত্যাদি) ঢালছে বছরে চারশো কোটি টন ; সমুদ্রের তলায় পুরু পলির স্তর অনেক উঁচু-নীচু অসমান জায়গা বুজিয়ে সমান ক'রে দেয়। পৃথিবীর সমস্ত সাগর এবং মহাসাগরের ভিতরে সব চাইতে পুরু পলির স্তর জমেছে বঙ্গোপসাগরের নীচে। এই পলি মূলত গঙ্গা ও ইরাবতীর অবদান। এই অঞ্চলে পলিমাটি ও পলিপাথর (sedimentary rock) সমবেতভাবে প্রায় দশ কিলোমিটার পুরু। এছাড়াও মানুষের নিক্ষিপ্ত অনেক আবর্জনাই শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে জমা হয়। কেবলমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরের বর্জিত আবর্জনাই বছরে এক কোটি টন,—যেটা জমেছে আটলান্টিকের তলায়।

পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, সাগরের তলাতেও পাহাড়-পর্বত, গহ্বর আর খাদের ব্যাপক সমাহারে আমাদের স্থলভাগেরই পরিচিত মানচিত্র। আমরা একে একে এই বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ঐ পাহাড় এবং গহ্বরের গভীর তাৎপর্য আছে। সে তত্ত্বও আমরা যথাসময়ে সংক্ষেপে হাজির করব। কিন্তু, প্রথমে সাগরের তলার জমি সম্পর্কে দু'একটা প্রাথমিক তথ্য জেনে রাখলে সুবিধা হয়।

সাগর-তলার উপরের স্তরে পলি বা কাদার স্তর—সচরাচর মাইলখানেক বা প্রায় দু' কিলোমিটার পুরু। স্থানবিশেষে এটা অনেক বেশী পুরু হ'তে পারে, তা'র নমুনা অবশ্য আমরা একটু আগেই দিয়েছি। এর নীচে এক বা দেড় মাইল পুরু লাভা-পাথরের স্তর। এবং এর নীচে সাগরের সত্যিকার তলদেশ। এরও অবশ্য নিজস্ব স্তরবিভাগ আছে, যে কথায় আমরা আর যাচ্ছি না।…এইবার সমুদ্রের তলার কয়েকটি বিশেষ রূপ নিয়ে আলোচনা করছি।

(ক) **খাদ** (Canyon): সমুদ্রের তলায় অতি গভীর এবং অতি দীর্ঘ খাদ বা উপত্যকার অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ধ'রে বিশেষজ্ঞের কাছে ধাঁধা হয়ে ছিল। পৃথিবীর উপরে যে খাদ বা উপত্যকার চেহারা দেখতে পাই (পাহাড়-অঞ্চল বাদে), তা' সাধারণত নদীর বা জল-প্রবাহের ঘর্ষণে তৈরী। নদী যখনই সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তখনই তা'র স্রোতের ধার লোপ পায়। সুতরাং, সাগরের নীচের খাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল অবশ্য, যেটা বেশ কিছুদিন চালু ছিল বিকল্প ব্যাখ্যার অভাবে। সমুদ্রের আদিকালে জলের পরিমাণ ছিল খুবই কম, এ তথ্য বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করেছিলেন (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এখনকার জলমগ্ন অনেক জায়গা তখন শুকনো ছিল। সে সময়ে নদী স্রোতে ঐ সব খাদ তৈরী হওয়া অসম্ভব নয়। অনেক পরে, সাগরের জল বেড়ে গেলে, ওগুলো গভীর জলের নীচে চ'লে যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা দু'টো কারণে বর্জনীয়। প্রথমত, সাগরে অল্প জল থাকার যুগটা সম্ভবত এত দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, যা'র ভিতরে কঠিন পাথরের বুকে অত গভীর খাদ নদীর পক্ষে তৈরি করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে ঐ রকম খাদ সমুদ্রের যে কোনো গভীরতায় লক্ষ করা গেছে। আদি-সাগরে যে সব জায়গা ঢাকা থাকবার কথা, সেখানেও।

এই গভীর খাদের অস্তিত্বের জন্য এখন দায়ী করা হয় সাগরের স্রোতকে।

সমুদ্রে নানা ধরনের স্রোত থাকে, একেবারে উপরের তলে, আবার বিভিন্ন গভীরতায়। এই স্রোতগুলোকে মনে করা যায়, সাগরের স্থির জল-রাশির ভিতরে গতিময় জলের নদী। [চতুর্থ অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।] সমুদ্রের একেবারে তলায় একজাতীয় মাটি-ঘেঁষা স্রোত থাকে, যে স্রোত ঘনতর জলের স্রোত। মহাদেশের বুক ধুয়ে জলের স্রোত যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন সূক্ষ্ম পলিবাহী জলধারা 'মহাদেশিক ঢাল' বেয়ে একেবারে তলায় চ'লে যেতে পারে ; এবং তলায় পৌঁছেও তার স্রোতের বেগ প্রচণ্ড থাকা সম্ভব—এমন কি, ঘণ্টায় ষাট মাইল ! এই 'ময়লা স্রোত' (turbidity current) দীর্ঘকালের চেষ্টায় সমুদ্রের বুকে গভীর খাদ সৃষ্টি করতে পারে, পৃথিবীর উপরে নদীরা যেমন করে। সাগর-তলার এই খাদগুলোর চেহারার সঙ্গে কলোর‍্যাডো নদীর বিখ্যাত খাদের তুলনা চলতে পারে (যদিও, কলোর‍্যাডো নদীর জল পাথর কেটে অত নীচে নেমে গেছে, এই প্রচলিত ধারণা ঠিক নয়)। তবে, সাগর-তলার খাদের দু'ধারের দেয়াল একদম খাড়া হয়ে থাকে, গভীরতাও কলোর‍্যাডোর খাদের তুলনায় অনেক বেশী হওয়া সম্ভব। বাহামা অঞ্চলের সমুদ্রে প্রায় তিন মাইল গভীর একটি খাদের অস্তিত্ব জানা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জাতীয় খাদ 25/30 মাইল অবধি লম্বা হ'লেও দু'শো মাইল লম্বা খাদও বিরল নয়।

(খ) **পাহাড়** (ridge বা rise) ঃ এই পাহাড়কে সাধারণত মধ্য-সাগরীয় পাহাড় (mid-ocean ridge) বলা হয়। এ এক ধারাবাহিক পর্বতমালা, যা' প্রায় সমস্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়েই এঁকেবেঁকে ঘুরে গেছে। সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার মাইল বা ষাট হাজার কিলোমিটার লম্বা এই পাহাড়ের কোনো তুলনা কোনো মহাদেশের বুকে নেই। পৃথিবীর পরিধিই অত বড়ো নয় ! এই পাহাড় প্রায় সম্পূর্ণই সাগরের জলের নীচে লুকোনো ; কেবল এক-আধ জায়গায় জল ফুঁড়ে বা'র হয়ে এসেছে সূর্যের আলোয়। ছোট্ট দ্বীপ সেণ্ট্ হেলেনা এই রকম এক নজীর। বড় নজীরের মধ্যে একমাত্র আইস্‌ল্যাণ্ডের নাম করা যায়। আইস্‌ল্যাণ্ড আসলে ঐ পাহাড়ের এক ক্ষয়িত চূড়া। যেখানেই এমন চূড়া মাথা তুলেছে, সেখানেই ক্ষয়ে ক্ষয়ে সমতল হয়ে এসেছে। জলের নীচে পাথরের ঘষা লাগে কম ; কিন্তু উপরে মাথা তুললেই বাতাস আর বৃষ্টির সহজ শিকার হয়ে যায়। তাই, মহাদেশের উপরে যে পাহাড়-পর্বত তা'রা দ্রুত ক্ষয় হয়।

এই পাহাড় প্রথম আবিষ্কৃত হয় আটলাণ্টিকের গভীরে। তা'র জলের

গভীরতা মাপতে গিয়ে দেখা গেল—মাঝ সাগরে গভীরতা সবচেয়ে কম। রীতিমত এক উঁচু জায়গা সেখানে। তখন অনেকের মাথায় এই ধারণা খেলে গেল, এইবার বোধহয় সেই কিংবদন্তীর রাজ্য আটলাণ্টিসের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ধারণাটা বলবৎ ছিল কিছুদিন ; তারপর, ওটা এক সুবিশাল ধারাবাহিক উচ্চতা, এটা বুঝে নিয়ে আটলাণ্টিস্‌বাদীরা হতাশ হয়ে পড়ে। আটলাণ্টিস্‌ প্রসঙ্গ নিয়ে গোটা একটা পরিচ্ছেদ [তৃতীয় পরিচ্ছেদ] এই বইতে আমরা জুড়ে দিয়েছি। তাই এ বিষয়ে এখানে আর কিছু বলছি না।

কেবল আটলাণ্টিকের নীচেই এই পাহাড় শ্রেণীর অবস্থান ঠিক মাঝ বরাবর। ভারত মহাসাগরে এর গঠন জটিল, এবং Y-অক্ষরের মত শাখাযুক্ত। প্রশান্ত মহাসাগরে এই পাহাড় অনেক নীচু এবং মসৃণ। তা'ছাড়া, ঠিক মাঝখানেও নয়। প্রথম দুই কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষেত্রে এই শৈলশিরা ridge-এর বদলে rise নামে পরিচিত।

সমুদ্র নিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণ করতে করতে তা'র তলদেশের উষ্ণতা মাপার কথাও মানুষের মাথায় আসে। দেখা যায় সাগরের নীচে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এই পাহাড়ের কোলে জমির উষ্ণতা বেশী। এখানে যেন পৃথিবীর গভীরতর স্তর থেকে বেশী উত্তাপ বা'র হয়ে আসছে। এছাড়া, আরও দেখা যায়, সাগরের তলায় পলির স্তর সর্বত্র সমান পুরু নয়। আলোচ্য পাহাড় শ্রেণীর আশেপাশে পলির স্তর কম পুরু ; কিন্তু, পাহাড় থেকে দূরে, সাগরের উপকূলের কাছে, পলির স্তর অনেক বেশী গভীর। মনে হয়, যেন পাহাড়ের দু'ধারের ঠিক সংলগ্ন জমি দূরবর্তী জমির তুলনায় কম প্রাচীন ; তাই বেশী পলি জমার সময় পায়নি। এই রকম প্রাথমিক কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে ধীরে ধীরে বোঝা গেল ঐ পাহাড় শ্রেণীর অস্তিত্বের গভীর তাৎপর্য। এ বিষয়ে নীচের অনুচ্ছেদে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী আলফ্রেড্‌ ভেগেনার (Alfred Wegener) এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঘোষণা করেন, সুদূর অতীতে সবগুলো মহাদেশ পরস্পরের সংলগ্ন ছিল। বিশ্ব-মানচিত্র দেখলে এই ধারণা অনায়াসে সম্ভব। উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকাকে পুব দিকে খানিকটা সরিয়ে আনলে আফ্রিকার সঙ্গে খাপে খাপ খেয়ে একটা অতি বৃহৎ মহাদেশ গ'ড়ে ওঠে। অস্ট্রেলিয়াকেও আফ্রিকার তলাতে মোটামুটি বসিয়ে দিলে বেখাপ্পা হয় না। এ ছাড়া ছোট

ছোট উদাহরণ তো বিস্তর। পারস্য উপসাগরের দুই তীর তো শতকরা একশো ভাগ মিলে যায়। ওটা স্পষ্টতই একটা ফাটল ঃ সৌদি আরবের অংশটা যেন পশ্চিমে স'রে যাচ্ছে। যদি সবগুলো, অথবা, প্রায় সবগুলো, মহাদেশ অতীতে একত্র হয়ে থাকে, তবে তা'রা কীভাবে আলাদা হ'ল ?…এই বিষয়টা ভেনেগার-সাহেব যেভাবে আলোচনা করেছেন, তা' পরবর্তী কালের জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে খানিকটা সংশোধিত হয়েছে। আমরা আধুনিক রূপটাই তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।…এটা মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত যে, সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবী মোটামুটি তরল অবস্থায় ছিল। এর স্বপক্ষে দু'টো মস্ত প্রমাণ আছে। প্রথমত,

ছবি ঃ 2
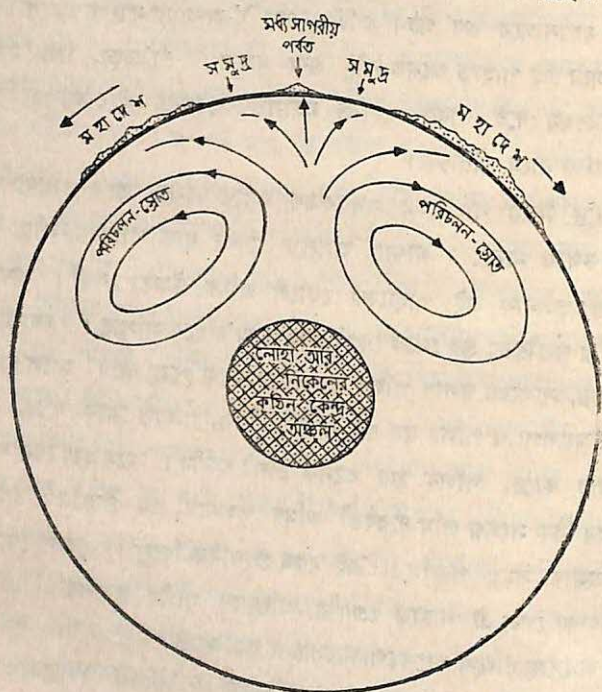
পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে খানিকটা চ্যাপ্টা। এটা হয়েছে তা'র নিজস্ব ঘূর্ণনের ফলে ; এবং বরাবরই শক্ত দেহ নিয়ে থাকলে আকৃতিতে ঐ বিকৃতি আসতো না। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ক্রমশ ভারি পদার্থের অবস্থান। অর্থাৎ, সবচেয়ে ভারী জিনিসগুলো সবচেয়ে গভীরে ডুবে গেছে, তরল দেহেই যেটা সম্ভব।…

বিকিরণের সুবিধার জন্য পৃথিবীর উপরটা সবার আগে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত চেহারা নিলেও ভিতরে একটা তরল অঞ্চল এখনও থেকে গিয়েছে, ভূকম্পনঘটিত পরীক্ষায় যা'র অস্তিত্ব ধরা পড়ে। পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি একটি কঠিন গোলোক, যা'র ব্যাসার্ধ প্রায় 1300 কিলোমিটার (প্রায় ৪00 মাইল); আর একেবারে উপরের কঠিন ত্বকটি 200—250 কিলোমিটার (প্রায় 125—150 মাইল) পুরু। এই দুই প্রান্তের ভিতরে প্রায় 4800 কিলোমিটার (3000 মাইল) গভীর অঞ্চলে যদিও আরও স্তরবিভাগ আছে, কিন্তু মোটের উপর এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে 'তরল' মনে করা যায়। এই তরল অঞ্চলে সর্বদাই বইছে বৃত্তাকার 'পরিচলন স্রোত' (convection current), এক বাটি গরম দুধ রাখলেও তা'র ভিতরে যেমন স্রোত বইবে। [ছবি : 2 দ্রষ্টব্য।] ছবিতে এরকম দু'টি স্রোত-বৃত্ত আমরা দেখিয়েছি, যদিও আসলে ঐ অঞ্চলে এরকম ক'টি বৃত্ত আছে, তা'দের সঠিক প্রবাহ-পথই বা কেমন, এ সব আমাদের কেবল আন্দাজেরই বিষয়। তবে, একটা কথা মনে রাখতে হবে, যাকে আমরা 'তরল' বলছি, সে আমাদের পরিচিত তরল বস্তুর মত নয়। অতিরিক্ত চাপ আর তাপে কঠিন জিনিসেরই এক জাতীয় 'তরলতা' (fluidity) দেখা দিয়েছে—এইমাত্র। একটু আগে আমরা বলেছিলাম, সাগরের তলায় পলি এবং লাভা- পাথরের আবরণের নিচেই আসল তলদেশ। এই জমিটা কঠিন ব্যাসাল্ট্ পাথরের, যে পাথর পৃথিবীর ত্বকের মূল উপাদান। আর মহাদেশের প্রধান উপাদান গ্র্যানাইট-পাথর, ব্যাসাল্টের তুলনায় হাল্কা এবং কম কঠিন। যেখানে যেখানে মহাদেশ আছে, পূর্বোক্ত ব্যাসাল্টের স্তরের উপরেই ব'সে আছে। পরিচলন-স্রোতটি আসলে বইছে সাগর-তলারও অনেক নিচে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও সাগর-তলার ব্যাসাল্ট-জমি কেমন করে চলমান—তা' দু'নম্বর ছবি দেখলে মোটামুটি স্পষ্ট হবে। দু'টি স্রোত-বৃত্তের মধ্য-অঞ্চলে গরম লাভা উপরে ঠেলে ওঠে এবং এখানেই তৈরী হয় মধ্য-সাগরের পর্বত, যা' নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসেছিলাম। সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে, এই মধ্য-সাগরীয় পর্বতের কোলেই পৃথিবীর গভীর থেকে গলিত লাভা আস্তে আস্তে ঠেলে বা'র হয় বেলনাকারে (cylindrical form-এ)—টুথ্ পেস্টের টিউবে চাপ দিলে যেমন হয়। (জলের নীচে ক্যামেরা নামিয়ে এই ছবি তুলে আনা হয়েছে অজস্র।) উদ্গত নতুন লাভা উপরে আসতে আসতেই জ'মে যায়। এই নবাগত শিলা-

রাশিকে জায়গা দিতে গিয়ে পর্বতের দু'ধারে সমুদ্র-তলা স'রে যেতে থাকে। এইভাবে সাগরের তলায় ব্যাসাল্টের স্তর সতত চলমান। মহাদেশগুলো যেন এই ব্যাসাল্ট-ত্বকের উপরে ছোটখাট গ্র্যানাইটের স্তূপ। সুতরাং, তা'রাও চলমান। এবং এই কারণে মধ্য-সাগরের পর্বতের দু'ধারের জমি সব সময়েই দূরবর্তী জমির তুলনায় নতুন। এইভাবে সাগরের গোটা তলদেশই ক্রমশ নতুন হয়ে চলে, যা'কে বলা হয় 'সাগর-তলার বিস্তার' (sea-floor spreading)। একটা কথা এখানেই ব'লে রাখা যায়ঃ মহাসাগরের তলদেশে এই 'বিস্তার'-এর পদ্ধতিটি বিজ্ঞানীর কাছে যতটা স্পষ্ট, মহাদেশের ঠিক নীচের ছবিটা তত স্পষ্ট নয়। তবে, মহাদেশগুলোর সঞ্চরণশীলতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্বোক্ত ব্যাসাল্টের 80—100 কিলোমিটারের মতো পুরু একটি স্তরকে বলা হয় 'প্লেট্'। এই প্লেট্ চলমান, যে পদ্ধতি এইমাত্র আমরা ব্যাখ্যা করেছি, সেই পদ্ধতিতে। সমস্ত পৃথিবীর এই ব্যাসাল্ট-ত্বককে অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড ছোট-বড় প্লেটে ভাগ করা যেতে পারে, যদিও এই বিভাগ-রেখা এখনও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এক-একটি প্লেটের গতির অভিমুখ এক-এক রকম। অনেক ক্ষেত্রে একটি মহাদেশ একাধিক প্লেটের উপরে ব'সে আছে। সেক্ষেত্রে, মহাদেশটি ঐ সব প্লেটের বিভাগ-রেখা বরাবর টুকরো হয়ে যাবে। ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড আমেরিকা-মহাদেশ ছেড়ে পশ্চিমে স'রে যাচ্ছে ; সৌদি আরব এশিয়া থেকে আংশিক বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঝখানে পারস্য উপসাগর তৈরি করেছে।…আবার উল্টোটাও হয়। ভারতবর্ষ অনেক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এশিয়ার স্পর্শ পেয়েছে। এমনই কঠিন স্পর্শ, ধাক্কার চোটে স্পর্শ-রেখায় ভূ-ত্বক ভাঁজ হয়ে আকাশে উঠেছে, যা'র নাম হিমালয় পর্বত। এই পর্বত এখনও উঠছে।

ছবি ঃ 3 (ক) প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান ট্রেঞ্চ্

1. কারমাডেক ট্রেঞ্চ্ (Kermadec Trench), 2. টোংগা ট্রেঞ্চ্ (Tonga Trench), 3. নিউ হেব্রিড্স্ ট্রেঞ্চ্ (New Hebrides Trench), 4. মিন্দানাও ট্রেঞ্চ্ (Mindanao Trench), 5. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ্ (Mariana Trench), 6. কুরিল্ ট্রেঞ্চ্ (Kuril Trench), 7. অ্যালুটিয়ান্ ট্রেঞ্চ্ (Aleutian Trench), 8. মিড্ল্ আমেরিকা ট্রেঞ্চ্ (Middle America Trench), 9. পেরু-চিলি ট্রেঞ্চ্ (Pere-Chile Trench)→

এশিয়া
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
অস্ট্রেলিয়া
প্র. শা ন্ত ম হা সা গ র
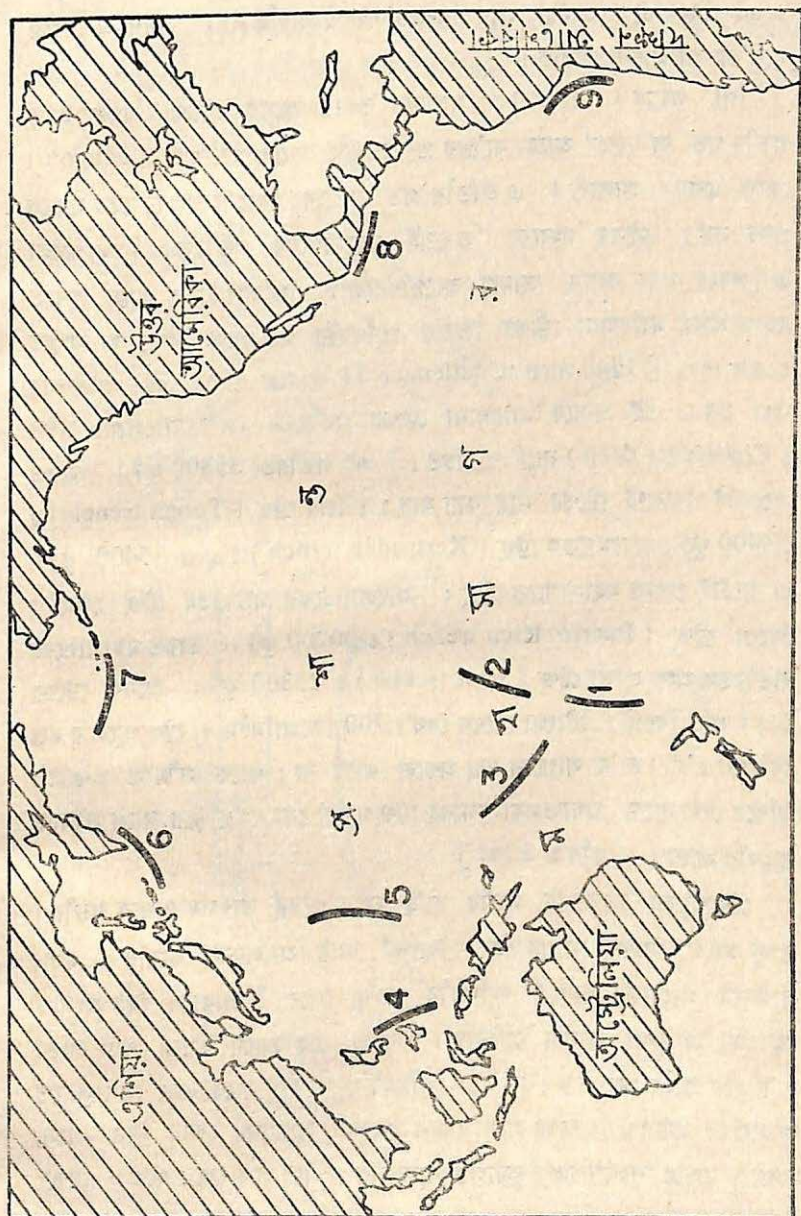
…এই বিষয়টিকে আমরা আর বিস্তৃত করতে পারছি না। অন্যত্র এ বিষয়ে পূর্ণতর আলোচনা করেছি।*

(গ) **গহ্বর** (trench) ঃ সাগরের তলায় অনেক জায়গায় কিছু অতি গভীর গর্ত বা 'ট্রেঞ্চ্' আছে, যা'দের প্রকৃতি পূর্ব আলোচিত 'খাদ' (canyon) থেকে একদম আলাদা। এ জাতীয় গর্ত বা গহ্বর কোনো জল-স্রোতের ঘর্ষণে সৃষ্ট নয়। এইসব গহ্বরের ভিতরেই মহাসাগরের গভীরতম বিন্দুগুলো আবিষ্কার করা যায়। আমরা আগেও বলেছি, ফিলিপাইনের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেঞ্চের ভিতরে পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু আবিষ্কৃত হয়েছে।** [1948 সালে 'Challenger II'-জাহাজ থেকে এই আবিষ্কার করা হয়। এই সুবাদে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতম অংশ চ্যালেঞ্জার ডীপ (Challenger deep) নামে পরিচিত।] এই গভীরতা 35800 ফুট। আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ট্রেঞ্চের নাম করা যায় ঃ টোংগা ট্রেঞ্চ্ (Tonga trench) ঃ 35400 ফুট ; কারমাডেক ট্রেঞ্চ্ (Kermadec trench) ঃ এ-ও 35400 ফুট। এ দুটোই প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রেঞ্চ্। আটলাণ্টিকের গভীরতম ট্রেঞ্চ্ পোর্টো রিকো ট্রেঞ্চ্ (Puerto Rico trench) ঃ 30200 ফুট। ভারত মহাসাগরের গভীরতম অংশ জাভা ট্রেঞ্চ্ (Java trench) ঃ 25300 ফুট। অনেক ট্রেঞ্চের দৈর্ঘ্য অতি বিরাট। টোংগা ট্রেঞ্চের দৈর্ঘ্য 700 কিলোমিটার। ট্রেঞ্চ্গুলোর মস্ত বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা'রা সাগরের মধ্য-অঞ্চলে থাকে না ; থাকে সীমান্ত অঞ্চলে। ছবিতে দেখা যাবে, প্রশান্ত মহাসাগরের ট্রেঞ্চ্গুলো কেমন ছড়িয়ে আছে সীমান্ত প্রহরীর মতো। [ছবি ঃ 3 (ক)]

ট্রেঞ্চ্গুলো নিজেরাই গভীর তা'ই নয় ; ওদের তাৎপর্যও খুব গভীর। একটু আগে আমরা 'সাগর-তলার বিস্তার' নিয়ে আলোচনা করেছি। মধ্য-সাগরীয় পাহাড়ের কোলে পৃথিবীর গভীর থেকে শিলারাশি উঠে আসছে ক্রমাগত, এ কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু, এক তরফা ভিতর থেকে লাভা বা'র হয়ে আসা সম্ভব নয় ; তা'হলে পৃথিবী ফাঁপা হয়ে যাবে, এবং ক্রমশ ফুলতে থাকবে। অতএব, ভিতরের লাভা যেমন ক্রমাগত সাগরের তলায় উঠে আসে, সাগরের তলার শিলাস্তরকেও ক্রমাগত পৃথিবীর গভীরে ঢুকে যেতে হবে। ট্রেঞ্চ্-

---

* 'চলমান দেশ' ঃ ফার্মা কে. এল্. এম্. প্রাঃ লিঃ ; কলকাতা। [1981]

** প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গুলো সেইসব জায়গা যেখান দিয়ে প্লেট্ নিম্নমুখী হয়ে ঢুকে যাচ্ছে পৃথিবীর গভীরে। (এই বিষয়টা বিশ্বাস করা সহজ হয় এই অঞ্চলের ফটো দেখলে।
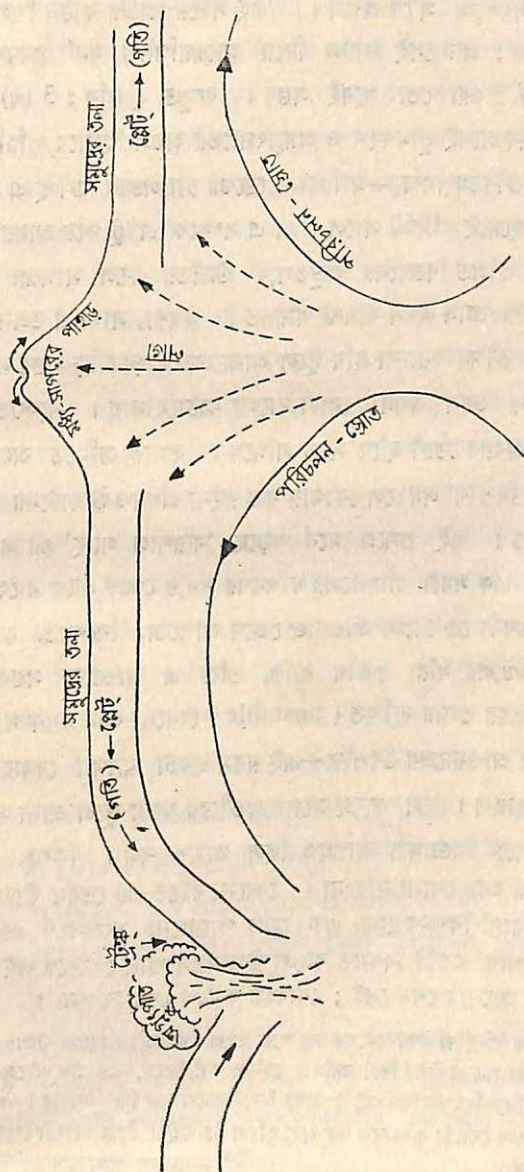
ছবি : 3 (খ)

ট্রেঞ্চের আশেপাশের ছোটখাট ঢিপিগুলো আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ছে ট্রেঞ্চের দিকে। বিছানার উপরে কয়েকটা বইপত্র রেখে চাদরটা একদিক থেকে টানতে থাকলে যেমন সবশুদ্ধ স'রে আসে।) এই সময়ে প্লেটের কঠিন শিলা-দেহের ভাঙচুর হয় অনেক; আর সেই ফাটল দিয়ে আগ্নেয়গিরির ধর্ম প্রকাশ পেতে পারে; ভূমিকম্প হওয়া তো খুবই সম্ভব। বস্তুত, [ছবি : 3 (খ)] ট্রেঞ্চ্-অঞ্চলগুলো বিশেষভাবেই ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অঞ্চল হিসাবে পরিচিত।

পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু—মারিয়ানা ট্রেঞ্চের চ্যালেঞ্জার ডীপ্-এ মানুষের অবতরণ সম্ভব হয়েছে 1960 সালে। (এ সম্পর্কে একটু পরে আমরা বিস্তৃত খবর দিচ্ছি।) ফলিত-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সাগরের তলদেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখন যথেষ্ট পরিণত। অবশ্য, সাগরের তলার বিশাল বিস্তারের সর্বত্র পরীক্ষা করা বা ছবি তুলে আনা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। সে হিসাবে আমাদের জ্ঞান এখনও মোটা দাগের কাঠামোমাত্র। সূক্ষ্মতর রেখার যোজনায় পূর্ণ অবয়ব তৈরী হ'তে সময় লাগবে। তলার জমিতে অজস্র উঁচু-নীচু ভাঁজে আর বিস্তীর্ণ সমতলে কোথায় কত রহস্য এখনও উদ্ঘাটনের অপেক্ষায় আছে, বলা শক্ত। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'বরিশাল গান্'-এর অনাবিষ্কৃত রহস্যের কথা। এক সময়ে বরিশালের দক্ষিণের সমুদ্র থেকে মাঝে মাঝে কামান-গর্জনের মতো একটা জোরালো আওয়াজ ভেসে আসতো, বিশেষত, ঝড়-বৃষ্টির সময়ে। ওই অঞ্চলের যাঁরা প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁরা এ আওয়াজ সম্ভবত শুনে থাকবেন। সাগরের তলার দুঃস্থিত (unstable) কোনো জমি মাঝে মাঝে স'রে যাওয়ার ফলে ঐ আওয়াজের উৎপত্তি—এই রকম একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টাও এক সময়ে হয়েছিল। সে যুগে জলের গভীরের ফটো তুলে আনা সম্ভব ছিল না; সাগর সম্পর্কে বিজ্ঞানীর আগ্রহও ছিল অনেক কম। কিন্তু, এখন ঐ আওয়াজ বোধহয় আর শোনা যায় না। কোনো বইতে এর তেমন উল্লেখও দেখা যায় না। চেম্বার্স-বিশ্বকোষের এক অতি পুরোনো সংস্করণে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। আর, একটি বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে এই ঘটনা।* সাগরের গভীরে রহস্যের শেষ নেই; বোধহয় কখনও শেষ হবে না!

* 'তখন চারিদিক কাঁপাইয়া উপনিবেশের ঝড় শুরু হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার ফনা তুলিয়া তেঁতুলিয়ার জল ভাঙা পাড়ের উপর দিয়া আসিয়া ছোবল মারিতেছে,—চর ইস্মাইলের নারিকেল আর সুপারির বন দিক-দিগন্তব্যাপী এই উৎসবের বিরাট আয়োজনে যোগ দিয়াছে। দক্ষিণ হইতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ঝোড়ো বাতাসকে থর্ থর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া ভাসিয়া গেল,—বরিশাল গান্ গর্জন করিতেছে।'

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ['উপনিবেশ']

*　　　*　　　*

পাহাড়ে ওঠা যেমন বিস্তর মানুষের সৌখিন নেশা, সাগরে নামা ঠিক তেমন কিছু হ'তে পারেনি। জলের নীচে নামা অনেক বেশী প্রস্তুতিসাপেক্ষ। বেশী নীচে নামতে হ'লে চাপ সহ্য করার উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থাও করতে হয়। তবু পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে ওঠার মত সাগরের সবচেয়ে নীচে নামার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের নিশ্চয়ই ছিল। তারই জের হিসাবে 1960 সালে [এভারেস্ট্ বিজয়ের দশকেই !] মার্কিন নৌ-বহরের উদ্যোগে দুই অভিযাত্রী সাগরের গভীরতম অংশ মারিয়ানা ট্রেঞ্চের গভীরতম বিন্দু চ্যালেঞ্জার ডীপ্-এ নেমেছিলেন। এঁদের নাম ডন্ ওয়াল্শ্ (Don Walsh) এবং জ্যাক্স্ পিকার্ড (Jaques Piccard)। বিশেষভাবে এই অভিযানের জন্যই তৈরী হয়েছিল একটি ডুবো-জাহাজ—TRIESTE। নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা করতেই তা'র আয়তনের প্রায় সবটুকু ভ'রে যায়। জাহাজের একেবারে তলায় কাচের জানালাওয়ালা ইস্পাতের একটি ছোট্ট গোলকের ভিতরে অভিযাত্রীদের থাকবার জায়গা হয়েছিল, যে জায়গায় দু'জন লোকের পক্ষে কোনওক্রমে কিছুক্ষণ কাটানো সম্ভব। এই ধরনের যানকে বলা হয় bathyscaphe।* সাড়ে তিন ইঞ্চি পুরু বিশেষ ইস্পাতে ঐ গোলকটি তৈরী হয়েছিল। বড়ো জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি কেন, তা' সহজেই আন্দাজ করা যাবে। যেখানে জলের চাপ হয়ে দাঁড়ায় (এক বর্গ সেণ্টিমিটারে) প্রায় হাজার কিলোগ্রাম, সেখানে কক্ষের আকার বড়ো হ'লে চাপ সামলানো তা'র পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ঠিক কোন্ জায়গা বরাবর নীচে নেমে গেলে গভীরতম বিন্দুটি পাওয়া যাবে, তা' যতদূর সম্ভব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা যায়, ঐ বিন্দুর আসল গভীরতা ছিল 35800 ফুট। গভীরতম বিন্দু হওয়াই সম্ভব ! ঐ তলায় পৌঁছোতে সময় লাগে তিন ঘণ্টা আটত্রিশ মিনিট। মজার কথা, ঐ গভীরতায় একটি মাছকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল, প্রায় এক ফুট লম্বা

---

* এই জাতীয় গোলকের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে সাগরের গভীরে নামার প্রথম মহানায়ক William Beebe (1877—1962)। একান্ন বছর বয়সে ইনি প্রথম bathysphere-এর পরিকল্পনা করেন, এবং বার্মুডার কাছে তিন হাজার ফুট গভীরে নামেন। এই বইয়ের শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে bathyscaphe এবং bathysphere দ্রষ্টব্য।

মাছ। খুবই অস্বাভাবিক বলতে হবে।...অন্যতম অভিযাত্রী ডন্ ওয়াল্‌শ-এর নিজের লেখায় তাঁর অভিজ্ঞতার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

'...আমরা নামতে শুরু করার চার মিনিট পরে 'আণ্ডারওয়াটার্ টেলিফোন'-এ উপরের সংযোগকারী বোট্‌কে জানালাম—আমরা আড়াইশো ফুট নেমেছি, এবং ঠিকই নামছি।...তিনশো ফুট নামার পরে জলের উষ্ণতা ঝপ্ ক'রে নেমে গেল। ঠাণ্ডা জল যেহেতু গরম জলের চেয়ে বেশী ঘন, এই সময়ে জলের ঊর্ধ্ব-চাপ বেড়ে গেল, আমাদের নিম্নগতি বন্ধ হ'ল। এটা হবে জানতাম। এই স্থিতিকাল কাজে লাগানো হয় যন্ত্রপাতি শেষবারের মত একবার দেখে নিয়ে। তারপর গ্যাসোলিন্-ট্যাঙ্ক্ থেকে খানিকটা গ্যাসোলিন্ বা'র ক'রে দিয়ে আমরা আবার নীচে নেমে যেতে লাগলাম।...ছ'শো ফুট নীচে নামতেই ঘন গোধূলি ঘিরে এল ; চারিদিকের রং ঢেকে গেল ধূসরতায়। এক হাজার ফুট নীচে আলো সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। আমরা আমাদের আলো জ্বাললাম। মাঝে মাঝে সামুদ্রিক প্রাণীরা জেগে উঠতে লাগল আমাদের সামনে। ক্ষুদে প্রাণী-বিন্দু-গুলো সাঁ সাঁ ক'রে উঠে যাচ্ছিল, আমাদেরই নিম্ন-গতির ফলে। আমরা বেশ বেগে নামছিলাম ; সেকেণ্ডে চার ফুটের মতন।

'আমাদের গোলকের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা নেমে এল। আমরা গরম-জামা পরার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে-ও এক নাটক বটে! আটত্রিশ ইঞ্চি বাই আটত্রিশ ইঞ্চি জায়গায় দু'টো পূর্ণ বয়স্ক লোকের পক্ষে পোশাক বদলানো!

'...কথাবার্তা আমরা খুবই কম বলছিলাম। খুব ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল। অনেক যন্ত্রপাতি ছিল সামলাবার, এবং অনেক কিছু ছিল রেকর্ড্ করবার। এরই মাঝে একটা ঘটনাও হ'ল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সংযোগকারী তার যেখান দিয়ে আমাদের গোলকের মধ্যে ঢুকেছে, সেই জায়গায় একটা 'লিক্' দেখা দিল। তখন আমরা দশ হাজার ফুট নেমেছি। টপ্ টপ্ ক'রে জল আসতে লাগল ভিতরে। আমি ঘড়ি দেখে দেখে বুঝলাম, ওটা আর বাড়ছে না। আমাদের ধারণা ছিল—পনেরো হাজার ফুট নামার পরে জলের প্রচণ্ড চাপে ঐ 'লিক্' আপনিই বুজে যাবে। এবং তা-ই হ'ল।...আণ্ডারওয়াটার টেলিফোনে বাইরের জগতের সঙ্গে কথাবার্তার যে যোগাযোগ রেখেছিলাম, 15000 ফুট নীচে নামার পরে সে যোগাযোগও নষ্ট হ'ল ; তবে সঙ্কেত পাঠাবার ব্যবস্থা ঠিকই ছিল।...27000 ফুট গভীরে নেমে আমাদের গতি কমিয়ে করা হ'ল সেকেণ্ডে দু' ফুট।

এই গভীরে কোথায় কোন্ স্রোত আছে জানি না। তা'দের কারোর খপ্পরে প'ড়ে ট্রেঞ্চের দেয়ালে আছড়ে পড়তে রাজী নই।...30000 ফুট গভীরে নেমে হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম কীসের সঙ্গে! তারপর আমাদের যানটি কাঁপতে লাগল মৃদু ভূমিকম্পের মতো।...কিন্তু, না; আমরা আবার নেমে যেতে লাগলাম আগের মতোই! ব্যালাস্ট্ ট্যাঙ্ক্ থেকে আরও কিছু ভার ফেলে দিয়ে গতিটা কমিয়ে করা হ'ল সেকেণ্ডে এক ফুট।...36000 ফুট পার হয়ে গেলে জ্যাক্স্ ব্যাজার হয়ে জানতে চাইল—সাগরের তলাটা আমরা পেরিয়ে গিয়েছি কি না!... তারপর, গভীরতা-মাপা যন্ত্রে যখন 37500 ফুট, তখন আমাদের সুবেদী ফ্যাদোমিটারে তলাকার জমির অস্তিত্বের ইশারা ধরা পড়ল।...পরিষ্কার জলের মধ্য দিয়ে আমরা তলায় পৌঁছোলাম। তলায় ঠেকবার ঠিক আগে এক অপূর্ব সৌভাগ্য আমাদের হ'ল। পোর্ট-হোলের মধ্য দিয়ে জ্যাক্স্ একটা মাছ দেখতে পেল। মনে হ'ল, সাগর-তলার জমিতে সে খাদ্য খুঁজে ফিরছে।...প্রায় এক ফুট লম্বা তা'র শরীর। আমাদের হঠাৎ আগমন,—তীব্র আলোর দ্যুতি নিয়ে, যা' সে কখনও দেখেনি,—তা'কে মোটেই বিচলিত করেছে ব'লে মনে হ'ল না। আমাদের লক্ষ্য-সীমায় মিনিটখানেক থেকে আস্তে আস্তে সে সাঁতরে চ'লে গেল আঁধারে; আমাদের আলোক-সীমার বাইরে। উত্তেজনার ঘটনাই বটে। স্পষ্টতই এটি সাগর-তলার প্রাণী। অর্থাৎ সারা জীবনই কাটিয়েছে এই বিরাট গভীরতায়, অতি প্রচণ্ড চাপে।...দুপুর একটা দশ মিনিটে আমরা নরম জমিতে ঠেকলাম আস্তে ক'রে। আমাদের যন্ত্র তখন গভীরতা দেখাচ্ছে 37800 ফুট। পরে, গবেষণাগারে ঐ যন্ত্রটি সতর্কভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়—ঐ গভীরতা আসলে হবে 35800 ফুট।*

'...কাদার মেঘ চারিদিক থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলেছিল। তখন আর চোখে কিছুই দেখার উপায় ছিল না।

'...জ্যাক্স্ ও আমি শেক্-হ্যাণ্ড্ করলাম। তারপর সে খুলে ধরল সুইজারল্যাণ্ডের একটি জাতীয় পতাকা; এবং আমি আমেরিকার।

'...দশ মিনিট বাদে বাইরের কাদা-ঘোলা থিতিয়ে গিয়ে আবার সব কিছু বেশ দেখা যেতে লাগল। জ্যাক্স্ এই সময়ে আর একটি প্রাণী দেখতে পেল চকিতের জন্য। বোধহয় চিংড়ি-জাতীয় কোনো জীব।

---

* প্রথম পরিচ্ছেদের পাদটীকার হিসেবটা পূর্বজ্ঞাত হিসেব,—জলের উপর থেকে মাপা।

'…কুড়ি মিনিট আমরা ছিলাম ঐ তলায়। তারপর ব্যালাস্ট্ ট্যাঙ্ক্ থেকে দু'টন ভার ফেলে দিয়ে উপরে উঠতে লাগলাম।…আমাদের উপরে ওঠার সময়ে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল। আমাদের যানটির সঙ্গেই কিছু কাদা উঠে এল ; এবং এমন তীব্র গতিতে সেই কাদার কণাগুলো আমাদের জানালার সামনে দিয়েই উপরে উঠে যেতে লাগল, আমরা ভেবেছিলাম—আমরা নির্ঘাৎ নীচে নামছি !'

তিন

তথ্য এবং তত্ত্ব-সন্ধানে অনেকখানি সময় দেবার পরে আমরা নিশ্চয়ই একটি লঘু এবং অর্ধ-প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনার অধিকার অর্জন করেছি। বস্তুত, 'আট্‌লাণ্টিস্‌'-এর কাহিনী বাদ দিলে প্রয়োজনের দাবিতে হয়তো ফাঁক পড়ে না, কিন্তু আমাদের ঘরোয়া সাগরিক আলোচনা ভীষণভাবে জখম হয়। আটলাণ্টিক মহাসাগরের নামকরণই হয়েছে আটলাণ্টিসের কাহিনী থেকে। ঐ কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো, দু'হাজার বছরেরও বেশী আগে। তারপর ঐ গল্প এতকাল শুধু টিঁকে আছে তা'ই নয়; তা'র জনপ্রিয়তা কুড়ি শতাব্দীর উপর কেবল বেড়েই গেছে। 'আটলাণ্টিস্‌' নিয়ে বই বা'র হয়েছে অন্তত দু'হাজার, এবং আজও নতুন বই প্রকাশ পায়। চলচ্চিত্রও বাদ যায়নি। মাঝে মাঝে কিছু বিজ্ঞানী এবং সমুদ্রপ্রেমী মানুষ কখনও পুঁথি ঘেঁটে, কখনও সাগরের অগভীর তলা ঢুঁড়ে 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' ব'লে চীৎকার জোড়েন। আটলাণ্টিস্‌-প্রসঙ্গ নতুন ক'রে ফুটতে থাকে উৎসাহের তাপে।

প্লেটোর লেখাই এ বিষয়ে মূল তথ্য। তিনি যা' লিখেছেন, তা'র সারাংশ এই রকম ঃ এথেন্সের জনৈক মন্ত্রীজাতীয় ব্যক্তি 590 খ্রীস্টপূর্বাব্দে একবার মিশরে গিয়েছিলেন। মিশরের জনৈক পুরোহিত তখন তাঁকে কথায় কথায় বলেছিলেন—'বহুকাল আগে তোমাদের দেশে অতি সুন্দর আর মহান এক জাতির বাস ছিল, যেমনটি আর হয় না। তাদের কাছে তোমরা আর তোমাদের শহর নাবালকের অধম। কিন্তু তারপর হ'ল প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্প আর জলোচ্ছ্বাস। একদিন আর এক রাতের মধ্যে আটলাণ্টিস্‌ ঢুকে গেল পৃথিবীর ভিতরে; সবসুদ্ধ হারিয়ে গেল সমুদ্রের তলায়।'...মন্ত্রীপ্রবর ঐ সংবাদে কতদূর আহ্লাদিত হয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন, জানা যায় না। এবং তিনি নিজে এ ব্যাপারে কিছু লিখে রেখে যাননি। তবে, তাঁর এক বন্ধুকে কথাটা বলেছিলেন। ঐ বন্ধুর নাতি খবরটা শোনেন বড়ো হয়ে ঠাকুর্দার মুখে। ঐ নাতিটি আবার ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য,—অর্থাৎ, প্লেটোর গুরু-ভাই। প্লেটো সেই সূত্রে খবরটা শোনেন এবং লিখে রাখেন।

পুরোহিত বলেছিলেন—'তোমাদের দেশে'! কিন্তু, গ্রীস্-দেশে নয় নিশ্চয়ই। কারণ, সে দেশ ধ্বংস হয়নি দেখাই যাচ্ছে। হওয়া সম্ভব—গ্রীসের কাছাকাছি কোনো দ্বীপ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া যা'র পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং আটলাণ্টিস ভূমধ্যসাগরের কোনো দ্বীপ হয়ে থাকতে পারে। প্লেটোর বর্ণনায় আমরা ঐ দেশের মোটামুটি বিস্তৃত পরিচয় পাই।—'আটলাণ্টিসের নাগরিকরা ছিল বীর এবং বীরত্বের উপাসক। এই দেশের সুশিক্ষিত সৈন্যদল প্রায়ই আক্রমণ করতো ইউরোপ এবং আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড। লিবিয়া তা'রা প্রায় সম্পূর্ণ জয় ক'রে ফেলেছিল, এবং এথেন্স্ আক্রমণ করতেও ছাড়েনি। ঐ বিশাল দ্বীপ 'আটলাণ্টিস্' উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া মাইনরের যুক্ত বিস্তৃতির চেয়েও বড়ো ছিল।' (এই শেষের কথাতে কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। অত বড় দ্বীপ ভূমধ্যসাগরে আঁটবে না। যাইহোক, আটলাণ্টিসের আরও বর্ণনা শোনা যাক।) 'আটলাণ্টিসের উপকূল পাহাড়-ঘেরা, কিন্তু মাঝখানটা সমতল এবং উর্বর। সেখানে গাছ-পালা, শাক-সব্জি, জন্তু-জানোয়ারের (হাতী সমেত) অভাব নেই। নগরটি ছিল এঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যার চরম নিদর্শন। নগরের কেন্দ্রে ছিল রাজপ্রাসাদ এবং সাগর-দেবতা 'পোসিডন্'-এর মন্দির। সেই মন্দিরের সাজ-সজ্জায় আর কারুকার্যে বিপুল পরিমাণ সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত আর নাম-না-জানা ধাতুর সমারোহ। মন্দিরের দিকে তাকালে মনে হ'ত—আগুন জ্বলছে। এই কেন্দ্র-ভূমিটি ছ'শো ফুট চওড়া পরিখার বৃত্তে ঘেরা ছিল। এই খালের বাইরে আবার বৃত্তাকার জমি, বারোশ' ফুট চওড়া; এবং সেটা আবার বারোশ' ফুট চওড়া খালে ঘেরা। এর পরে আবার আঠেরোশ' ফুট জমি, এবং আঠেরোশ' ফুট চওড়া খাল—যা'র মধ্যে জাহাজ চলতে পারে। একদিকে আড়াআড়ি খাল কেটে দ্বীপের কেন্দ্র থেকে পরিধির বাইরে সমুদ্র অবধি যুক্ত করা ছিল।'

আটলাণ্টিসের প্রশাসনিক ব্যবস্থারও কিছু পরিচয় আমরা পাই। তার ভিতরে বারোশ' সুন্দর জাহাজের উল্লেখ আছে। কিন্তু এত ক'রেও শেষ অবধি সব গেল। ঐ দেশের লোকজন নিজেদের সমৃদ্ধির অহংকারে দেবতাদের অপ্রীতিভাজন হ'ল। দেবরাজ জিউস্ তখন অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে এক মহতী সভায় মিলিত হ'লেন। সেই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলেই উল্লিখিত ভূমিকম্প আর জলোচ্ছ্বাসে আটলাণ্টিসের চির সমাধি।...এই শেষের লাইনটা অবশ্য

প্লেটো লেখেন নি। তা'র আগেই আচমকা শেষ করেছেন ঐ আলোচনা। কিন্তু, জিউস্ যখন ক্ষেপে গিয়ে দেবতাদের মিটিং ডেকেছেন, তখন ও ছাড়া আর কী হ'তে পারে!

প্লেটোর বর্ণনা কতখানি বাস্তব, কতখানি প্লেটোনিক—তা' নিয়ে জল্পনার আজও শেষ হ'ল না। যাঁরা সোজাসুজি এই কাহিনীকে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ভিতরে প্লেটোর প্রধান শিষ্য অ্যারিস্টটল্ অন্যতম। তিনি গুরুর পরিবেশিত ঐ গল্প লক্ষ ক'রে কিঞ্চিৎ অম্ল-বাক্য নিক্ষেপ করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু ঐ কাহিনীকে বাস্তবতাবর্জিত মনে করেন নি, এমন গুণী লোকও বিস্তর জন্মেছেন। গত শতাব্দীর মার্কিন রাজনীতিবিদ ডনেলী-সাহেব (Ignatius Donnelly) 'Atlantis : The Antediluvian World' নামে একটি বই লেখেন [1882], যা'র বিপুল ও অভিনব পাণ্ডিত্য বিশ্বব্যাপী চমক লাগায়, এবং বইটি ধারণাতীত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ডনেলী-সাহেব নতুন কিছু আবিষ্কার না-ক'রে পূর্বজ্ঞাত তথ্যেরই নতুন বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ করেন। সমুদ্র-বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি অজস্র বিষয় থেকে তিনি তাঁর আলোচনার রসদ সংগ্রহ করেন। তিনি যে প্লেটোর বর্ণনায় বিশ্বাস ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন, এমন নয়। তাঁর বিপুল ও জটিল আলোচনা-জালে ঐ দেশ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও উঠে আসে। এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে না। ডনেলী-সাহেবের ঐ বইকে আধুনিক বিশেষজ্ঞরা আমল তো দেনই না, বরং ভর্ৎসনা করেন ; যেহেতু ঐ আপাত-পাণ্ডিত্যে পাঠকরা সহজেই প্রতারিত হ'তে পারেন।···আজ পর্যন্ত আটলান্টিসের সম্ভাব্য স্থান নির্দেশ করা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রায় পঞ্চাশটি জায়গায়। নেতাজী যেমন ছদ্মবেশে পৃথিবীর বহু জায়গায় একই সঙ্গে আছেন, আটলাণ্টিসের অস্তিত্বও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তেমনি সন্দেহ করা হয়। এর ভিতরে মেক্সিকো উপসাগরের বিমিনি অঞ্চলে সাগরের তলায় সুন্দর আয়তক্ষেত্রাকার পাথরের একাধিক পাটাতন আবিষ্কার হওয়ায় আটলাণ্টিস্‌টা কিছু দিনের জন্য ঐ অঞ্চলে বাসা বেঁধেছিল। পরে গবেষকরা দেখে-শুনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—ঐ শিলান্যাস নেহাতই প্রাকৃতিক।

কিন্তু, একজন নমস্য পর্যটকের নাম এই প্রসঙ্গে করা উচিত। ইনি ব্রিটিশ সেনা-বিভাগের কর্নেল ফসেট্ [Percy H. Fawcett : 1867—1925 (?)];

দক্ষিণ আমেরিকার অজস্র অজানা, মৃত্যু-ভয়াল অঞ্চলে প্রথম পদার্পণের সূত্রে তিনি স্মরণীয়। যদিও তাঁর সবচেয়ে সফল কাজ বলিভিয়ার সীমানা নির্ধারণ করা ; কিন্তু স্বপ্নপ্রবণ এই দুঃসাহসীর আমাজনসংলগ্ন অরণ্য-ভ্রমণের কাহিনী রূপকথার চেয়েও চমকপ্রদ। [তাঁর ডায়েরী 'Exploration Fawcett' নামে প্রকাশিত।] তিনি কোনওভাবে সুনিশ্চিত হন, ব্রাজিল একদা অতি সভ্য এক জাতির উপনিবেশ ছিল, যা'রা এসেছিল কিংবদন্তীর নগরী 'আটলাণ্টিস্' থেকে। তাঁর ধারণা ছিল, ব্রাজিলের গভীর অরণ্যে ঐশ্বর্যমুখর রোম নগরীর চেয়েও সুসজ্জিত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ তিনি পাবেনই। আটলাণ্টিস্ নিজে জলের তলায় চ'লে গেলেও, ঐ ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা ক'রে তা'র সম্পর্কে অনেক কথা জানা সম্ভব হবে। এই বিশ্বাসে 1920-21 সালে তাঁর প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। 1925 সালে তাঁর দ্বিতীয় অভিযানে তিনি রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। পরবর্তীকালে তাঁর খোঁজে সম্ভাবনাময় এবং দুর্গম অনেক অঞ্চলে অভিযান চালানো হয় ; কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

তবে, আধুনিক পণ্ডিতদের অনেকেই আটলাণ্টিসের একটি ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যা দিতে আগ্রহী। মোটামুটি দেড়-হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মিনোয়ান-সভ্যতার কথা তাঁরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেন। ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা এবং জ্ঞান-গরিমা—সব কিছুরই উৎস হিসাবে গ্রীস দেশকে দীর্ঘকাল ধরে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু, এখন থেকে সাড়ে-তিন বা চার হাজার বছর আগে গ্রীক-সভ্যতা যখন ছিল নিতান্ত সাধারণ দশায়, তখন ক্রীট্ এবং আরও কিছু দ্বীপে মিনোয়ান্-সভ্যতা অনেক বেশী অগ্রগামী। এই সভ্যতা আচমকা ধ্বংস হয়ে যায় ; এবং সব ক'টি দ্বীপে একই সঙ্গে ধ্বংস হয়। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বোঝা যায়, বিরাট প্রাসাদ এবং অন্যান্য সৌধ সে সময়ে একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, অন্তর্বিপ্লবে বা বহিরাক্রমণে ঐ সভ্যতা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, ধারণাতীত রকমের প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সভ্যতাটি ধ্বংস হয়েছে। অগ্ন্যুৎপাত এবং বিস্ফোরণ ঘটে সান্তোরিনি-দ্বীপে, যা'র অবস্থান ছিল গ্রীস্ এবং ক্রীট-দ্বীপের মধ্যবর্তী জায়গায়*—ভূমধ্যসাগরে। এই দ্বীপের অবশেষ এখনও সমুদ্রের উপরে

* মানচিত্র দ্রষ্টব্য। বর্তমানে সান্তোরিনি-দ্বীপ Thira বা Thera নামে পরিচিত।

জেগে আছে। অগ্ন্যুৎপাত এবং বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা বুঝতে হ'লে 1883 সালে ক্রাকাতোয়া-দ্বীপের [ইস্ট্ ইণ্ডিজ : 6° দক্ষিণ—105°·24 পূর্ব] অগ্ন্যুৎপাত স্মরণ করা যেতে পারে। এই দ্বীপের গোড়ায় প্রথমে ফাটল ধরে ; সমুদ্রের ঠাণ্ডা জল সেখানে এসে ঢোকে। গরম লাভা এবং ঠাণ্ডা জল একত্র হয়ে বিপুল বাষ্প জমা হয় আগ্নেয় পাহাড়ের তলায়। বাষ্পের ভীষণ চাপে পাহাড়ের চূড়াটি দ্বীপের দেড়-হাজার ফুট বাইরে ছিটকে পড়ে। পাথরের চাঁই ছুটে যায় পঞ্চাশ মাইল অবধি। ধূলিজাল কেবল ঐ অঞ্চলকেই নয়, গোটা পৃথিবীকেই গ্রাস ক'রে রাখে অনেক দিন। অগ্ন্যুৎপাত শেষ হ'লে ফাঁপা আগ্নেয় পাহাড়টি ধ্বসে যায় ছ'শো ফুট গভীর জ্বালামুখের গর্ভে। প্রচণ্ড গর্জনে সাগরের জল এসে ঐ জায়গা গ্রাস করে, যা'র প্রচণ্ডতায় পাঁচশো মাইল দূরের ঘর-বাড়ী কেঁপে ওঠে ; তিন হাজার মাইল দূর থেকেও সেই আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।...ক্রীট্-দ্বীপের নিকটবর্তী সান্তোরিনি-দ্বীপের ক্ষেত্রেও এই ঘটনাই বোধহয় ঘটেছিল, যদিও অনেক বেশী প্রচণ্ডতায়। ধ্বংসের পরে দ্বীপের যে অবশেষ ছিল, তা' ঢাকা ছিল একশো ফুট গভীর ভস্মের নিচে। প্রায় আশি হাজার বর্গমাইল জায়গায় ভস্ম বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, এবং সমুদ্রের নীচে এই ভস্মের পুরু আস্তরণ আজও আবিষ্কার করা যায়। এক্ষেত্রে অগ্ন্যুৎপাত শেষ হ'লে ফাঁপা আগ্নেয় পাহাড়ের কেন্দ্রটি বারোশ' ফুট নীচে ধ্বসে পড়ে। সাগরের জল ঐ শূন্য জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চতুর্দিক থেকে। বিশাল ঢেউ-এর চূড়া—আন্দাজ করা হয়—এক মাইল উঁচুতে ওঠে ; তরঙ্গাবর্তে মিনোয়ান্-সভ্যতা ধ্বংস হয় ; মিশরের কিছু অঞ্চলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব সিদ্ধান্তে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিন্‌কোভিচ্ এবং হীজেন্ [D. Ninkovich ; B. C. Heezen] সুনিশ্চিত। তবে, বহু ছোট-বড় ভূখণ্ডে ছড়ানো মিনোয়ান্-সভ্যতার অল্প কিছু মানুষ সম্ভবত এখানে-ওখানে রক্ষা পায়। কিন্তু, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত স্বদেশে নতুন ক'রে বেঁচে থাকা আর সম্ভব ছিল না। তারা গ্রীসের নিকটতম উপকূলে চ'লে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। (গ্রীসের উপকূলও ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; কিন্তু বাতাসের গতির আনুকূল্যে কোনও রকমে বেঁচে যায়।) এই সময় থেকে গ্রীক্-সভ্যতার কিছু সুস্পষ্ট উন্নতি বিশেষজ্ঞরা লক্ষ করেছেন।...মনে হয়, এই ঘটনাই মিশরবাসীরা দীর্ঘকাল স্মরণে রেখেছিলেন। আটলাণ্টিসের কাহিনীর এ-ই হয়তো ঐতিহাসিক ভিত্তি।

প্লেটোর দেওয়া তথ্য অনুসারে অবশ্য ঐ ধ্বংসের সময়টা প্লেটোর যুগেরও 9000 বছর আগেকার এবং আটলাণ্টিসের আয়তন 80000 বর্গমাইল, ভূমধ্য-সাগরে যা'র জায়গা হওয়া অসম্ভব। এ বিষয়ে আথেন্স সিসমোলোজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক গ্যালানোপোলস [A. Galanopoulos ; সাস্তোরিনির ধ্বংসাবশেষের ইনিই আবিষ্কর্তা।] মনে করেন, মিশর থেকে খবর-নিয়ে-আসা সেই গ্রীক মন্ত্রীমশাই মিশরীয় সংকেত ঠিকমত পড়তে পারেন নি। 100-কে 1000 ভেবেছেন। তাই তাঁর দেওয়া সব তথ্যই দশগুণ জোরালো। আসলে সময়টা হবে তাঁর 900 বছর আগের, এবং দ্বীপটার বিস্তৃতি হবে 8000 বর্গ-মাইল। তবেই দ্বীপের আকার বাস্তবানুগ হয়; এবং সময়টাও গিয়ে দাঁড়ায় ঐ দেড়-হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছে।

আলোচিত এই ব্যাখ্যা মোটের উপর সত্য হওয়াই সম্ভব। মিশরের প্রাচীন প্যাপিরাস-দলিলেও ঐ ধ্বংস-লীলার কথা আবেগমুখর ভঙ্গীতে লেখা আছে : '…দেশটা একেবারে শেষ হ'ল !…সূর্য ঢাকা পড়েছে ; আর আলো দেয় না। …হায় ! পৃথিবীর সব স্বর, সব কোলাহল শেষ হ'ল।'

বাইবেলে বর্ণিত দাস-বৃত্তিবদ্ধ ইস্রায়েলীরাও কি মিশরীয়দের এই উদভ্রান্ত অবস্থার সুযোগেই মিশর ছেড়ে পালায়? বাইবেলের কথায়—ঐ সময়টা হ'ল সলোমনের রাজত্বের চতুর্থ বছর।* যেহেতু সলোমন রাজত্ব শুরু করেন 970 খ্রীস্টপূর্বাব্দে, এই সময়টাও সান্তোরিনির বিস্ফোরণের সময়ের কাছাকাছি চ'লে যায়।**

* দ্রষ্টব্য : 'পুরাতন নিয়ম'। 1 রাজাবলি 6 : 1 এবং যাত্রাপুস্তক 9 : 20—25 ; 10 : 21—23

** মিনোয়ান-সভ্যতা সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব একাদশ শতকে ধ্বংস হয়।

চার

এই পরিচ্ছেদে সমুদ্রের স্রোত নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই। ঢেউ, কিংবা যে কোনো রকমের গতি নিয়ে নয়; সমুদ্রের স্থায়ী স্রোত নিয়ে। সমুদ্রের সর্বত্রই স্রোত আছে ভাবলে ভুল হবে। বরং, সমুদ্রের স্রোতগুলোকে মনে করা যায় 'সমুদ্রের নদী'। নদী সম্পর্কে আমাদের যা' ধারণা : জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত জলধারা ; অর্থাৎ, জলের স্রোতের দু'ধারে ডাঙা ; ঠিক এই ছবিটাই সমুদ্রের বেলায় কাজে লাগাব। কিন্তু এবারে জলের মধ্য দিয়ে বইবে জল ; অর্থাৎ, স্থির জল-রাশির মধ্য দিয়ে বইবে একটি জলস্রোত! জনৈক বিজ্ঞানীর ভাষায় : No one stands on their banks to admire their beauty ; no one writes songs or poems about them. Yet they are the Earth's greatest rivers,—the dark silent mysterious currents that flow through the seas. [কেউ তাদের তীরে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করে না ; গান আর কবিতা লেখে না ওদের নিয়ে। তবু ওরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো নদী,—অন্ধকার নিঃশব্দ রহস্যময় স্রোত, যা'রা সমুদ্রের ভিতর বইছে।]...এ স্রোত সমুদ্রের উন্মুক্ত তলে থাকতে পারে ; থাকতে পারে সমুদ্রের গভীর স্তরেও ; এমন কি, একেবারে তলায়। আমাদের পরিচিত সাধারণ নদীর মতো এদেরও সুনির্দিষ্ট প্রবাহ-পথ থাকে ; ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো সামান্য বদলায় সাময়িকভাবে।

মানুষ স্মরণাতীত কাল আগে থেকে সমুদ্রযাত্রা করতো ; কিন্তু, সামুদ্রিক স্রোতের অস্তিত্বে তা'র প্রথম ধারণা জন্মালো মাত্র সেদিন : 1513 খ্রীস্টাব্দে। 'ধারণা'ও ঠিক নয় ; একটা আবছা সন্দেহ। স্পেন্-এর পন্‌কে দে লেওন (Ponce de Leon) ফ্লোরিডার উপকূল ধ'রে জাহাজ চালাচ্ছিলেন। দক্ষিণমুখী বাতাসে তিনি পাল তুলেছিলেন দক্ষিণদিকে এগোবার ইচ্ছায়। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর জাহাজ এগোচ্ছিল উত্তরে। ঘটনাটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। অবশ্য, এখন আমরা বলতে পারি, তিনি আসলে বিখ্যাত উপসাগরীয় স্রোত 'গাল্‌ফ্ স্ট্রীম্'-এর পাল্লায় পড়েছিলেন, যে স্রোত সব সময়ে উত্তরমুখী।... ঘটনাটি তখন চাপা পড়ে যায়, এবং তারপর আড়াইশো বছর চাপা প'ড়েই

থাকে। পরে যিনি নতুন ক'রে এই প্রশ্নটা খুঁচিয়ে তোলেন—তিনি স্বনামধন্য বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্ক্লিন (Benjamin Franklin), তখন আমেরিকান্ কলোনীর পোস্ট্মাস্টার্ জেনারেল্। তিনি জানতে চাইলেন: ব্রিটেন থেকে উত্তর আটলাণ্টিক পার হয়ে যে মেল্-জাহাজ আসে, বাণিজ্য-জাহাজের তুলনায় সে দু'সপ্তাহ বেশী সময় নেয় কেন! প্রশ্নটা তিনি করলেন এক তিমি-শিকারী জাহাজের ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন জানালেন: উত্তর আটলাণ্টিকে এক বিরাট স্রোত বইছে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ অভিমুখে। সুতরাং উল্টোদিকে আসার সময়ে আমরা ঐ স্রোতটা এড়িয়ে চলি।—ফ্র্যাঙ্ক্লিন জিজ্ঞাসা করলেন: মেল্-জাহাজের ক্যাপ্টেন্কে এটা জানান না কেন?—তিমি-ক্যাপ্টেন্ বিরক্ত হয়ে বললেন: ও সব পণ্ডিতরা আমেরিকান্ জেলেদের কাছ থেকে কিছু জানতে চায় না!…ফ্র্যাঙ্ক্লিনের উদ্যোগে 'গাল্ফ্ স্ট্রীম্' নতুন করে প্রচার পেল। কেবল প্রচার নয়; ফ্র্যাঙ্ক্লিন যেহেতু খবর পেলেন—গাল্ফ্ স্ট্রীম্ নিরক্ষ অঞ্চল থেকে আসা একটি উষ্ণ-জলস্রোত, এবং উষ্ণতা পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই সে স্রোতের গতিপথ বা'র করা চলে, তিনি তিমি-মারা জাহাজগুলোতে রাশি রাশি থার্মোমিটার বিলি করতে লাগলেন ঐ কাজটি ক'রে দেবার জন্য। এই-ভাবেই গাল্ফ্ স্ট্রীমের প্রথম মানচিত্রটি তৈরী হয়। এর এক শতাব্দী পরে আরও বড়ো এক পরিকল্পনায় নামেন মার্কিন নৌ-বহরের লেফ্টেন্যাণ্ট্ ম্যাথু ফণ্টেন্ মরি (Mathew Fontaine Maury)। তিনি সব রকম জাহাজেই প্রাথমিক কিছু পর্যবেক্ষণের যন্ত্র দিয়ে দিতে শুরু করলেন, আর সবাইকে অনুরোধ করলেন—তাঁরা পৃথিবীর যে কোনো সমুদ্রেই যখন থাকুন না কেন, প্রতিদিনের বাতাস এবং জলের স্রোত সম্পর্কে যেন সবকিছু লিখে রাখেন।… এইসব তথ্য সংগ্রহে, এবং তারপর সেই তথ্য বিশ্লেষণে অনেক বছর কেটে গেল। তারপর পৃথিবীময় সমুদ্রের বুকে নানান বিচিত্র স্রোতের পথগুলো স্পষ্ট হ'তে লাগলো। বিশাল বিশাল বৃত্তাকার স্রোত; কেউ ঘুরছে বামাবর্তে, কেউ দক্ষিণাবর্তে। 4নং ছবিতে প্রধান সামুদ্রিক স্রোতগুলো দেখানো হয়েছে। [বই-এর শেষে দ্রষ্টব্য।] বলা বাহুল্য, এই স্রোতগুলো সবই সমুদ্রের উপরের তলের স্রোত। গভীর স্তরেও স্রোত আছে প্রচুর; কিন্তু, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা এখনও তেমন পরিষ্কার নয়। এই পরিচ্ছেদের আলোচনা মূলত সাগরের উন্মুক্ত তলের জন্যই।

এই স্রোতগুলো চলে কেন! জানা যায়, এই বিশাল স্রোতের কোনো-কোনোটা সেকেণ্ডে পাঁচ কোটি টন জলও ব'য়ে থাকে। সুতরাং এদের চালনার বলটাও বেশ জোরদারই হওয়া দরকার। কিসের জোরে এরা চলে?···এরা মূলত চালিত হয় সাগর সংলগ্ন বাতাসের স্রোতের অভিমুখে। সব সময়ে সেটা হুবহু সম্ভব না-হ'লেও ঐটিই মূল চালক-বল। এছাড়া অবশ্য উষ্ণতার এবং ঘনত্বের অসমতার দরুনও স্রোত সৃষ্টি হ'তে চায়। (বলাবাহুল্য সাগরের গভীরতর স্তরে, যেখানে বাতাসের গতি বিশেষ কিছু নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না, সেখানে শেষের দু'টি কারণই প্রধান ভূমিকা নেয়।) স্রোতগুলো ঘূর্ণমান হ'তে চেষ্টা করে পৃথিবীর নিজের ঘোরার জন্যই। এ আলোচনা আমরা বিস্তৃতভাবে করব, একটু পরেই। এখন আমরা পরপর তিনটি অংশে আলোচনা করছি তিনটি বল সম্পর্কে, যে বলগুলো জল-স্রোত বইবার পিছনে প্রধানত অংশ নিয়েছে।

* * *

প্রথমেই সংক্ষেপে ব'লে নেওয়া যাক অভিকর্ষজ বলের কথা। যে জলস্তম্ভের উচ্চতা (বা গভীরতা) Z, সে চাপ দিতে পারে $\rho Zg = p$—এই পরিমাণ। ρ নির্দেশ করে জলের ঘনত্ব এবং g ঐ জায়গায় অভিকর্ষজ ত্বরণ। এটি বল-বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক এবং সরল সূত্র। (Z যদি সেণ্টিমিটারে মাপা হয়, তবে ρ এবং g মাপা হবে গ্রাম / ঘন সেণ্টিমিটারে এবং সেণ্টিমিটার / সেকেণ্ড বর্গে; এবং সেক্ষেত্রে p প্রকাশিত হবে ডাইন / বর্গ সেণ্টিমিটারে।) একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় Z অপরিবর্তিত থাকলেও চাপের তারতম্য হওয়া সম্ভব জলের ঘনত্বের পরিবর্তনের জন্য। লবণাক্ততা সব অঞ্চলে এক রকম না-হবার দরুন ঘনত্বের তারতম্য হয়; এবং এর ফলে একই গভীরতাতেও সর্বত্র সমান চাপ পড়ে না। তাছাড়া, অঞ্চল বিশেষে উষ্ণতার ভেদ থাকার দরুনও ঘনত্বের পরিবর্তন হতে পারে। এই দুই কারণে সম গভীরতায়ও স্রোত সৃষ্টি হ'তে পারে; যেহেতু জল বেশী চাপের এলাকা থেকে কম চাপের এলাকায় যেতে চাইবে।

যেখানে অনেকখানি অঞ্চল জুড়েও উষ্ণতা বা লবণাক্ততার তেমন কিছু হের-ফের হচ্ছে না, সেখানেও কি সম গভীরতায় চাপের তফাত থাকা সম্ভব?—পাঠক যদি একটু সতর্ক থাকেন, এবং 'সম গভীরতা'র বদলে একটি অনুভূমিক তল

জলের ভিতরে কল্পনা করেন (যে তলের বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই ওলন-দাঁড়র সঙ্গে লম্ব-ভাবে থাকা।), তা'হলে বলা যেতে পারে—হ্যাঁ ; উষ্ণতার এবং লবণাক্ততার প্রশ্ন বাদ দিলেও ঐ তলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন চাপ থাকা সম্ভব, যদি জলের মুক্ত তলটি অনুভূমিক না-থেকে কাৎ হয়ে থাকে। এটা প্রথম দৃষ্টিতে মজাদার মনে হলেও অদ্ভুত ঘটনা কিছু নয়। অনেক সময়ে জোরালো বাতাসের ধাক্কায় উপকূলবর্তী অঞ্চলের কিছুটা জল তীরের দিকে ঠেলে আসতে পারে, এবং এই অবস্থা অনির্দিষ্ট কাল থাকতে পারে। মুক্ত তল তখন আর অনুভূমিক নয়। অতএব, জলের নীচে কোনো অনুভূমিক তলের উপর চাপের তফাত থাকতেই হবে ; কারণ Z-এর মান এখন পরিবর্তনশীল। দু'টি বিপরীতমুখী বাতাসের প্রভাবে সমুদ্রের যে কোনো জায়গাতেও একই রকমের ঘটনা ঘটা সম্ভব। এক্ষেত্রেও মুক্ত তলের অনুভূমিকত্ব নষ্ট হবে ; জলের বাড়তি সঞ্চয় ঘটবে একটি অঞ্চলে। জলের নীচে যে কোনোও গভীরতায় কল্পিত একটি অনুভূমিক তলে যদি Δn অনুভূমিক দূরত্বের পার্থক্যের জন্য চাপের পরিবর্তন Δp হয় তবে $\Delta p/\Delta n$-কে বলা যাবে অনুভূমিক চাপের পরিবর্তনের হার। এই গাণিতিক রাশিটিকে পরে আমরা স্মরণ করব।

* * *

সাগর-স্রোতের উপরে পৃথিবীর আহ্নিক ঘূর্ণনের (যা'র জন্য দিন-রাত্রি হয়।) প্রভাব বুঝতে হ'লে একটু জটিল আলোচনার ভিতরে যেতেই হবে। গণিত-ভীরু পাঠক পাতা উল্টে পার হয়ে গেলে বলার কিছু নেই। কিন্তু, সামান্য ধৈর্য ধরলে আংশিকভাবে হলেও একটা ধারণা নিশ্চয়ই তৈরি করা সম্ভব হবে।

একটা বিরাট বড়ো ঘূর্ণমান মঞ্চ কল্পনা করুন, ঠিক যেমন রেকর্ড্ প্লেয়ারের মঞ্চটা। সমবেগে সেটা ঘুরছে। আপনি যদি এর উপরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা'হলে অবশ্য আপনার চোখে এই ঘোরার ব্যাপারটা ধরা পড়বে না ; কারণ আপনি নিজেও ঐ সঙ্গে ঘুরে যাচ্ছেন। এখন ঐ পাটাতনের উপর দিয়ে একটি বস্তু যদি সরল রেখায় চলে, আপনার দৃষ্টিতে ঐ গতি সরল পথে থাকবে না। গতি-পথের বিচ্যুতি হবে। আপনি তা'হলে নিশ্চয়ই মনে করবেন—একটা বাড়তি বল ঐ বস্তুর উপরে কাজ করছে, যা'র জন্য গতি-পথ বেঁকে গেল।

পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে যখন আপনি কোনো গতিশীল বস্তুকে দেখেন, তখনও একই ব্যাপার হয় ; এবং ঐ অলীক বলের নাম 'কোরিওলি-বল' (Coriolis force), গত শতাব্দীর ফরাসী গণিতবিদ্ গ্যাস্‌পার্ কোরিওলি (Gasperd Coriolis)-র নাম অনুসারে। এই অলীক বলের মান এবং দিক বা'র করার গাণিতিক পন্থা আমরা নির্দেশ করছি না। কেবল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল নিয়ে আলোচনা করছি।

এটা বলা বাহুল্য, 'বেগ' এমন একটি রাশি, যা'র একটি মান এবং দিক—দুইই আছে। বেগবান কোনো বস্তুর একটি অভিমুখ না থেকেই পারে না। কোনো বিন্দুতে থাকা-কালে একটি বস্তুর গতিবেগকে তা'হলে একটি তীর-চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। ঐ তীরের মুখ বেগের দিক নির্দেশ করবে ; আর তীরের দৈর্ঘ্য বোঝাবে বেগের মান। কতো জোরালো গতি বোঝাতে কত লম্বা তীর আঁকবো, সেটা আমাদের ব্যাপার। যদি মনে করি, তীরের এক ইঞ্চির অর্থ ঘণ্টায় দশ মাইল, তা-ও মনে করতে পারি ; কিন্তু অন্যান্য বেগের জন্যও তখন ঐ একই মাত্রা ব্যবহার করতে হবে। (মানচিত্রের এক-এক অংশ যেমন আলাদা-আলাদা স্কেল অনুসারে হ'তে পারে না।) আবার, আর এক ধরনের

ছবি ঃ 5
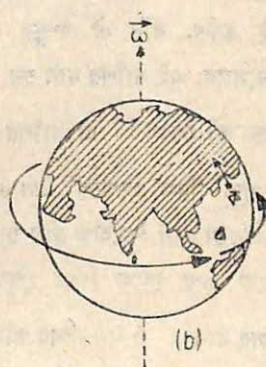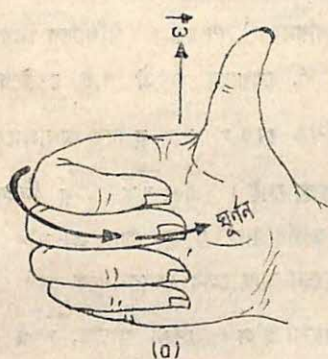
রাশি আছে, যা'দের তীর-চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করার কোনো মানে হয় না। যেমন ঃ সময় কিংবা আয়তন। এখানে অভিমুখের প্রশ্নই নেই। যা'দের পরিমাণ এবং অভিমুখ দু'টিই আছে, তা'দের বলে 'ভেক্টর রাশি'। গতিবেগ, বল ইত্যাদি ভেক্টর রাশি।…এখন, কোনো বস্তু যদি কোনো রেখা বরাবর না-

এগিয়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে, তবে এ-ও তো একটা গতি হ'ল বটে! রৈখিক গতি না-হয়ে হ'ল ঘূর্ণ-গতি। কিন্তু, এই ভেক্টরের অভিমুখ কিভাবে নির্দেশ করা হবে?…এ সব ক্ষেত্রে নিয়ম হ'ল 'ডান-হাতের সূত্র' মেনে চলার। ডান হাত দিয়ে প্রচলিত ভঙ্গীতে কাউকে কাঁচকলা দেখান। অন্যান্য আঙুলের ডগা যদি ঘূর্ণনের দিক নির্দেশ করে, তবে, বুড়ো আঙুলের ডগা নির্দেশ করবে ঘূর্ণ-বেগের অভিমুখ; এবং এই দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর এই গতির দিক ও মান প্রকাশ করব। 5 নং ছবিতে এই ব্যাপারটাই বোঝানো আছে। এটুকু বুঝলেই অনেকটা বোঝা হয়ে গেল। বাকী যেটুকু বোঝার আছে, তা' এই ঃ

পৃথিবী ঘোরে পশ্চিম থেকে পূবে। (তাই পূব দিক থেকে সূর্যোদয় হয়।) 5 নং ছবিতে সেই অনুসারে ঘূর্ণন-গতির ভেক্টর $\vec{\omega}$ দেখানো হয়েছে। এখন ধরা যাক, কোনো দর্শক ক-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, এবং একটি বস্তু ঐ বিন্দুতে তখন গতিশীল। ক-বিন্দুতে ঐ গতিশীল বস্তুর বেগ যদি হয় $\vec{v}$ তবে প্রমাণ করা যায়, একটি অলীক বল দর্শকের চোখে ঐ বস্তুর গতিপথকে কিছুটা বিচ্যুত করবে, এবং সেই বলের পরিমাণ ও দিক নির্দেশ করবে $2m(\vec{v} \times \vec{\omega})$- এই রাশি, যদি ঐ বস্তুর ভর (বস্তু পরিমাণ) m হয়। গণিতের নিয়ম অনুসারে, এই রাশির মান হয় $2mv\omega \sin \phi$, যেখানে ϕ ঐ দুই ভেক্টরের অন্তর্বর্তী কোণ। ঐ রাশির দিক নির্দেশিত হবে $\vec{v} \times \vec{\omega}$-র দিক অনুসারে, যেহেতু 'দিক' সম্পর্কে $2m$-এর করণীয় কিছু নেই। এবং $\vec{v} \times \vec{\omega}$-র দিকও ঠিক করা হবে পূর্বোক্ত ডান-হাতের সূত্রে; অর্থাৎ বাকী চারটে আঙুল যদি v থেকে ω-র দিকে গিয়ে শেষ হয়, তবে বুড়ো আঙুলের ডগার দিকে হবে এই বলের মান। 6 (a)-নম্বর ছবিতে এটা বোঝানো হ'ল। দেখা যাচ্ছে, $\vec{v}$ ও $\vec{\omega}$ যে সমতলে থাকে, $\vec{v} \times \vec{\omega}$ বা আলোচ্য বলটি তা'র উপরে লম্বভাবে থাকতে বাধ্য।…এখন আমরা এই ফলাফল পৃথিবীর উপরে গতিশীল কোনো নদীর বা সাগর-স্রোতের উপরে প্রয়োগ করতে পারি। সুবিধের জন্য এমন একটি স্রোতের কথা ধরা যাক, যে চলেছে কোনো দ্রাঘিমা-রেখা বরাবর; অর্থাৎ উত্তর-বা দক্ষিণ-মুখে। 6 (b) নং ছবিতে ক-বিন্দুতে $\vec{v}$ ভেক্টর একটি উত্তরমুখী বেগ নির্দেশ

করে। ফলে, সংশ্লিষ্ট কোরিওলি-বলটি সদ্য আলোচ্য নিয়মে কার্যকর হবে; অর্থাৎ, দর্শকের ডান-হাত বরাবর কাজ করবে, যদি দর্শক স্রোতের অভিমুখে মুখ ক'রে থাকেন। ছবি থেকে স্পষ্ট হবে, এক্ষেত্রে $\vec{\omega}$ এবং $\vec{\nu}$ ভেক্টর দু'টির মধ্যবর্তী কোণ আসলে ঐ বিন্দুতে পৃথিবীর অক্ষ-কোণ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব,

ছবি ঃ 6
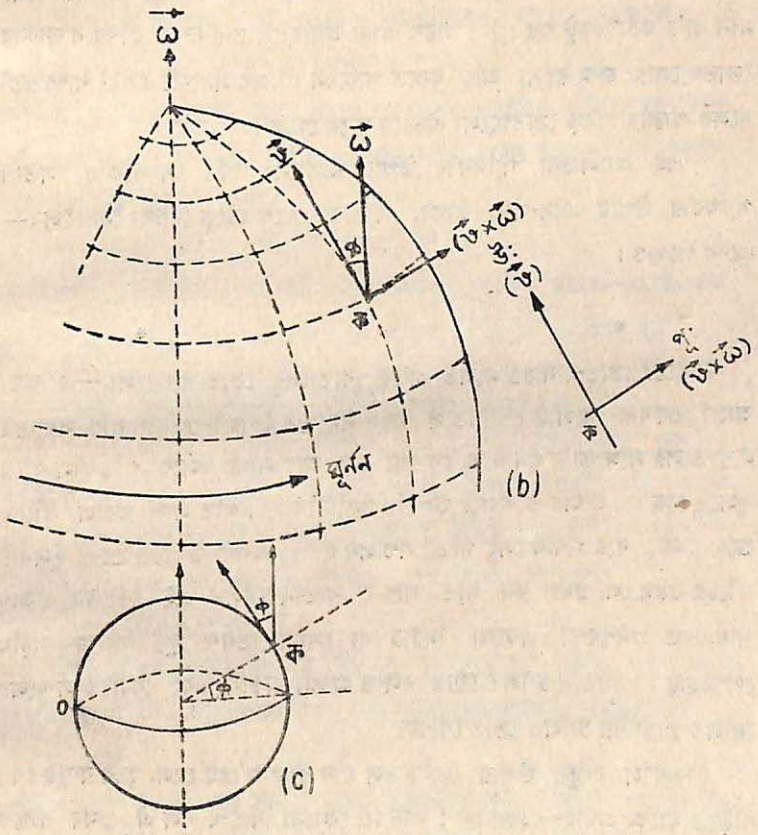
বলের মান দাঁড়াচ্ছে $2\rho\nu_{\omega}\sin\phi$ প্রতি একক আয়তন বস্তুর জন্য (ρ ঐ বস্তুর ঘনত্ব)। ϕ ঐ জায়গার অক্ষ-কোণ। এই বল পূবমুখী বল। অতএব, উত্তর গোলার্ধে উত্তরমুখী সাগর-স্রোত ক্রমশ পূবদিকে স'রে যাবার চেষ্টা করবে। এই স্রোত যতো উত্তরে এগোবে, এই বলের মান ততো বাড়বে; কারণ ϕ-এর মান

বাড়বে। (দক্ষিণ গোলার্ধে এই বল হবে পশ্চিমমুখী; পাঠক নিজেই ছবি এঁকে এবারে বুঝতে পারবেন।) ঠিক নিরক্ষ-বিন্দুতে (বিষুবরেখায়) উত্তর বা দক্ষিণমুখী স্রোতের উপরে এই বল কাজ করে না; কারণ, তখন $\vec{v}$ এবং $\vec{\omega}$-র অন্তবর্তী কোণ 'শূন্য' হয়; এবং $\sin 0=0$. (স্রোতের গতি অন্য কোনোমুখী হ'লেও কোরিওলি-বল একই নিয়মেই কাজ করে; যদিও এক্ষেত্রে কার্যকর বলের মান বা'র করা একটু শক্ত।) পাঠক এখন অনায়াসে চার-নম্বর ছবির বৃত্তাকার স্রোতগুলোর জন্ম-রহস্য আঁচ করতে পারবেন। সব সময়েই একটি পার্শ্ববর্তী বলের পাল্লায় প'ড়ে স্রোতগুলো ঐভাবে ঘুরে গেছে।

…এই আলোচনা পৃথিবীর উপরে বাতাসের গতি সম্পর্কেও সত্য। পৃথিবীর উপরে এসে-পড়া উল্কা, পৃথিবী থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মিসাইল,—এদের পক্ষেও।

* * *

সমুদ্রের স্রোত-মানচিত্র মূলত গ'ড়ে বাতাসের স্রোত-পথগুলো,—এ কথা আগে একবার বলেছি। বাতাস যখন সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে যায়, সমুদ্রের মুক্ত তলের সঙ্গে তা'র ঘর্ষণ তা'কে শ্লথ করে, আর সাগর-জলকে গতিশীল ক'রে তুলতে চায়। জলের একেবারে উপরের স্তরটি কিছুটা গতি লাভ করলে নীচের স্তরে কিছু দূর অবধি সেই গতির সঞ্চালন হয়। অবশ্য উপরের স্তরের তুলনায় নীচের স্তরগুলো ক্রমশ কম গতি পায়। বাতাস-চালিত এই স্রোতের প্রভাব সাধারণত কম-বেশী একশো মিটার বা সোয়া তিনশ' ফুট গভীর অবধি পৌঁছোয়। 'বাতাস-চালিত স্রোত' বলতে অবশ্য বাতাস এবং কোরিওলি-বলের মিলিত প্রচেষ্টায় চালিত স্রোত বোঝায়।

গতিশীল বস্তুর উপরে একটি বল যদি কাজ ক'রেই চলে, তবে বস্তুর বেগ বাড়তে থাকে, অর্থাৎ—ত্বরণ হয়; যদি-না কোনো বিরুদ্ধ বল ঐ প্রথম বলকে প্রশমিত করে। সাগর-স্রোতের বেগ কোথাও v হবার ফলে তির্যক কোরিওলি-বল কতখানি কাজ করে, আগেই তা' বলেছি। এই বলের অভিমুখেও ত্বরণ হবে কি না, তা' মূলত স্থির হয় এই অভিমুখে অভিকর্ষজ বলের প্রভাবকে সে প্রশমিত করতে পারবে কি না—তা'র উপর। কোনো ত্বরণ না-হবার শর্ত—এই দুই বলের প্রভাব ঠিক সমান হওয়া; অর্থাৎ, আমাদের আগেকার আলোচনা

অনুসারে $2\rho v\omega \sin \phi = \Delta p / \Delta n$ হওয়া। ডান-দিকের বলটি অবশ্যই গতির লম্ব দিকে কাজ করবে, কারণ—প্রথম বলটিও ঐ দিকেই ক্রিয়াশীল। অতএব, উত্তর গোলার্ধে উত্তরমুখী গতির জন্য সাগর-তলে একটি ঢাল থাকবে (বা, সাগরতল ঢালু হবে) পূব-পশ্চিম বরাবর, এবং পূবে জল ক্রমশ উঁচু হবে। যেহেতু, $p = Z\rho g$; অতএব, $\Delta p / \Delta n = \rho g \ (\Delta Z / \Delta n)$ লেখা যায় ; এখানে $\Delta Z / \Delta n$ অবশ্যই একটি সম-চাপ তলের ঢাল। তা'হলে দাঁড়াচ্ছে

$$v = g \ (\Delta Z / \Delta n) / 2\omega \sin \phi$$

ফলে, এখান থেকে v বা'র করা যায়, যদি ডানদিকের রাশিগুলোর মান জানা থাকে। গাল্‌ফ্‌-স্ট্রীম্‌-এর আড়াআড়ি সাগর-তলের ঢাল একশো কিলো-মিটারে প্রায় এক মিটার ; স্নতরাং,

$$\Delta Z / \Delta n = 1 / (100 \times 1000) = 10^{-5}$$

পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ (ω) চব্বিশ ঘণ্টায় 360°, অর্থাৎ—পুরো এক চক্কর। 360° র বদলে 2π রেডিয়ানও ধরা যায়। অতএব, ω-র মান হয়

$$\omega = \frac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} \text{ রেডিয়ান/সেকেণ্ড} = \frac{2 \times 3{\cdot}14}{24 \times 60 \times 60} \text{ বা}$$

$$7{\cdot}29 \times 10^{-5} \text{ রে/সে।}$$

ঐ অঞ্চলে g-এর মান মোটামুটি 980 সে. মি./সেকেণ্ড^2 ধরা যায়। বিষুব রেখা এবং মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে (অর্থাৎ মধ্য-মানের অক্ষ অঞ্চলে) $\phi \cong 45^\circ$ ধরলে $\sin \phi \cong 1 / \sqrt{2}$ বা $0{\cdot}71$ (প্রায়)। কাজেই $2\omega \sin \phi$ হবে প্রায় $2 \times 7{\cdot}29 \times 10^{-5} \times 0{\cdot}71$ বা 10^{-4}।

ঐ অঞ্চলে g-এর মোটামুটি মান 980 সে. মি./সেকেণ্ড^2 ধরলে v-এর মান দাঁড়ালো প্রায় $0{\cdot}98$ মিটার/সেকেণ্ড। এই গণনা মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।

* * *

সাগর-তলের স্রোত নিয়ে আমরা অনেকটা আলোচনা করেছি। সব মিলিয়ে যা' দাঁড়াচ্ছে তা' এই ঃ সাগরের মুক্ত তলে স্রোতগুলো বজায় থাকার পিছনে বাতাসের ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো। পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য এই স্রোতগুলো সাধারণত বৃত্তপথ নিতে চেষ্টা করে ; উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে (ঘড়ির কাঁটার মতো) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামাবর্তে (বিপরীত চক্রে) ঘোরে। সব সময়ে অবশ্য এই সরল নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। কারণ, নানা বিচিত্র

জ্যামিতিক চেহারার উপকূল এখানে-ওখানে জেগে আছে। এরা স্রোত-পথ বন্ধ করতে চেষ্টা করে। সাগরের নীচের উঁচু পাহাড়-পর্বতও স্রোতের মুখ অনেক সময়ে ঘুরিয়ে দিতে পারে ; কখনও বা দু'ভাগ ক'রে দেয়।—সাধারণভাবে আর কোনো মন্তব্য না-ক'রে আমরা এখন বিশিষ্ট দু'তিনটি স্রোত-মণ্ডল সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'-এক কথা বলব।

(ক) **পশ্চিম ও পূর্ব সীমার স্রোত**

সব ক'টি মহাসাগরেরই পশ্চিম সীমার স্রোত পূর্ব সীমানার স্রোতের চেয়ে জোরালো। বস্তুত, সদ্য আলোচিত ঘূর্ণি স্রোতগুলোর মধ্য-বিন্দুর পশ্চিমে স'রে যাবার একটা প্রবণতা আছে। এই রকম ক'রেই গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম্‌ এবং কুরোশিওর মত তীব্র পশ্চিমী স্রোতগুলোর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। এই ঘটনাও পূর্ব আলোচিত কোরিওলি-বলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা গিয়েছে। যদিও 4-নং ছবিতে প্রধান স্রোতগুলোর নাম আমরা উল্লেখ করেছি, তবু এখানে তিনটি মহাসাগরের সীমান্তবর্তী প্রধান স্রোতগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ'ল।

সীমান্ত	আটলাণ্টিক		প্রশান্ত		ভারত
	উত্তর	দক্ষিণ	উত্তর	দক্ষিণ	
পশ্চিম	গাল্‌ফ স্ট্রীম্‌	ব্রাজিল স্রোত	কুরোশিও স্রোত	পূর্ব-অস্ট্রেলীয় স্রোত	সোমালি স্রোত মোজাম্বিক্‌ স্রোত আগুলাস্‌ স্রোত
	…	…	…	…	…
পূর্ব	ক্যানারি স্রোত	বেঙ্গুয়েলা স্রোত	ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত	পেরু স্রোত	পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত

সীমান্তবর্তী যে দু'টি স্রোত নিয়ে সবচেয়ে বেশী গবেষণা বা পরীক্ষা হয়েছে, তা'রা গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম্‌ এবং কুরোশিও স্রোত। উপকূলের দিকে এদের সীমানা সনাক্ত করা যায় উষ্ণতা এবং লবণাক্ততার সুস্পষ্ট আধিক্যের রেখায়। রং দেখেও ঐ দু'টি স্রোতের উপকূলবর্তী সীমা সনাক্ত করা চলে।

(খ) **নিরক্ষ অঞ্চলের স্রোত-মণ্ডল**

নিরক্ষীয় অঞ্চল এবং তা'র নিকটবর্তী অঞ্চলে মূলত আধিপত্য চলে উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত (counter-current), নিরক্ষীয়

গর্ভ-স্রোত (under-current) ইত্যাদির। নিরক্ষ অঞ্চলের স্রোত-মণ্ডলে ঋতুগত পরিবর্তন যথেষ্ট, যেহেতু এই এলাকায় বাতাসের ঋতুগত পরিবর্তন খুব বেশী,—বিশেষত, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এই স্রোত-মণ্ডলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত।

(গ) **দক্ষিণ-মেরু সীমান্তবর্তী স্রোত**

আণ্টার্কটিকা মহাদেশের সীমানা একেবারে ছুঁয়ে একটি ক্ষীণ স্রোত বয় পশ্চিমমুখে। ঠিক এর পরেই—উপকূল থেকে আর একটু দূরে—একটি জোরালো স্রোত বইছে পশ্চিম থেকে পূবে ; এবং এই স্রোতই দক্ষিণ মেরুর সীমান্তবর্তী স্রোত (The Antarctic Circumpolar Current) হিসাবে পরিচিত। পূর্ববর্তী ক্ষীণ স্রোতটি উল্লেখযোগ্য নয়। পাশাপাশি এরকম দু'টি বিপরীতমুখী স্রোত থাকার কারণ—ওখানে ওই রকম দু'টি বাতাসের স্রোত আছে।

কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছিলাম, বায়ুচালিত স্রোত খুব গভীরে যায় না ; সচরাচর তিনশো, সাড়ে-তিনশো ফুটের বেশী নয়। কিন্তু, এই মেরু-সীমান্তের স্রোতটি এ হিসাবে মস্ত ব্যতিক্রম। এই শীতল স্রোত দশ থেকে ষোলো হাজার ফুট নীচের সাগর-তল অবধি সক্রিয়। এতখানি ছড়িয়ে পড়ার দরুন এর গতিবেগ অবশ্য বেশী নয় [15—20 সে. মি./সেকেণ্ড], কিন্তু প্রবাহিত জলের পরিমাণ বিশাল ; প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত পনেরো কোটি ঘন মিটার। এই স্রোত তিনটি মহাসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে ব'লে এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে।

* * *

এই পরিচ্ছেদে এতক্ষণ সাগরের মুক্ত-তলের স্রোত নিয়ে আলোচনা হ'লেও গভীর স্তরের স্রোতগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কিছু কম নেই। কিন্তু ঐ স্রোত সম্পর্কে তথ্য সন্ধানে অনেক দুরূহ, এবং পরোক্ষ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়ে এখনও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য ছবি আমাদের হাতে নেই। তবু এটা বলা যায়, গভীর স্তরের স্রোত সৃষ্টি হয় উষ্ণতা এবং লবণাক্ততার বৈষম্যেই প্রধানত। বাতাসের ভূমিকা একেবারে অগ্রাহ্য না হ'লেও এক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। গত কয়েক দশকে বিভিন্ন মহাসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে উষ্ণতা এবং লবণাক্ততা গভীরতার উপরে কতোটা নির্ভরশীল, তা' বা'র করার খানিকটা চেষ্টা হয়েছে। দেখা যায়, অন্য দু'টি মহাসাগরের চেয়ে আটলাণ্টিকের

জলের উষ্ণতা ও লবণাক্ততার গভীরতাভিত্তিক পরিবর্তন অনেক বেশী জটিল। উত্তর মহাসাগরের সঙ্গে জল বিনিময়ের ফলেই এই জটিলতার উদ্ভব ব'লে মনে হয়। পরন্তু, আটলাণ্টিকের সংলগ্ন কয়েকটি সাগর—বিশেষত, ভূমধ্যসাগর—বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করে। জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর আটলাণ্টিকের এক প্রান্তে উষ্ণতর এবং অতি লবণঘন জল মেশায়। ফলে আটলাণ্টিকের ঐ অংশে একটি বিশেষ পরিমণ্ডল তৈরী হয়।

সাগরের গভীরতম স্রোতগুলোর ভিতরে দক্ষিণ-মেরু সীমান্ত স্রোত অন্যতম। এই শীতল জলের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় সহজেই এ তলায় চ'লে যায়, এবং থালার উপর দিয়ে চিনির শিরা যেমন গড়ায়—তেমনি সাগরের তলা ঘেঁষে বহু হাজার মাইল দূরে ছড়িয়ে পড়ে। সাগরতলের গিরিখাত ধ'রেই এই স্রোত ছড়ায়। এই স্রোত সর্বত্রই মন্থর নয়। অনেক সময়ে সেকেণ্ডে 60 সে. মি.-ও হ'তে পারে।

* * *

সমুদ্রের স্রোত সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার পরে দু'টি বিশিষ্ট স্রোত সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে ধরা যাক 'উপসাগরীয় স্রোত' বা 'গাল্ফ্ স্ট্রীম্'-এর কথা। আগেই আমরা যা' বলেছি, এই স্রোতটিই যাবতীয় সামুদ্রিক স্রোতের ভিতরে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সেই হিসাবে এর কথা প্রথম উল্লেখযোগ্য তো বটেই। এ ছাড়া, ইউরোপের বহু দেশ এই স্রোতের কাছে কৃতজ্ঞ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য, যদিও এ বিষয়ে সাধারণের ভিতরে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা একটু পরেই আসছি।

'গাল্ফ্ স্ট্রীম্' ফ্লোরিডার উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রতি সেকেণ্ডে 70,000,000 টন উষ্ণ জল বয়ে নেয়—যা' মিসিসিপি নদী সমুদ্রে যে পরিমাণ জল ঢালে তা'র হাজার গুণ বেশী। এই স্রোত আবিষ্কারের প্রথম যুগে মনে করা হয়েছিল—মেক্সিকো উপসাগরে এর জন্ম, এবং সেই সূত্রেই এর নামকরণ হয়। ধারণাটি পরে ভুল প্রমাণিত হলেও নামটি টিঁকে থাকে। স্রোতটির প্রশস্ততা কুড়ি থেকে চল্লিশ মাইলের মধ্যে, যা' যথেষ্ট কম, এবং এর স্রোতের বেগ ঘণ্টায় চার মাইল পর্যন্ত হ'তে দেখা যায়, যা' মোটেই কম নয়। এই কম-বেশীগুলো অবশ্য অন্যান্য সামুদ্রিক স্রোতের সঙ্গে তুলনা ক'রেই বলা। গাল্ফ্ স্ট্রীমের গভীরতা প্রায় 2000 ফুট, অর্থাৎ, সাগর-তল থেকে শুরু ক'রে এই গভীরতা অবধি সে বিস্তৃত ; একে অনায়াসে নদীর গভীরতার সঙ্গে তুলনা

করা যেতে পারে। যে কোনো সামুদ্রিক স্রোতের মতোই এই স্রোতেরও উষ্ণতা সর্বত্র এক নয়। উপরের স্তরে স্থানবিশেষে দশ থেকে সাতাশ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্, এবং গভীরতর স্তরে বেশ ঠাণ্ডা—প্রায় দু' ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্ অবধি হয়। এর মধ্যে অবশ্য একটি তাপনতি-স্তরের অস্তিত্ব থাকতে পারে [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]—যে স্তরে গভীরতার সঙ্গে তাপমাত্রার হ্রাস আকস্মিকভাবে দ্রুত। গাল্ফ্ স্ট্রীম মোটামুটিভাবে উষ্ণ স্রোত হ'লেও ইউরোপের বৃহৎ এক অংশের শীতলতা প্রত্যক্ষভাবে দূর করার ক্ষমতা তা'র নেই। বরং, এই সংকীর্ণ, তীব্র স্রোত একটি প্রাচীরের মতো বাঁ-দিকের (উত্তর-পশ্চিমের) ঠাণ্ডা স্রোত এবং ডান-দিকের (সারগাসো সমুদ্রের) উষ্ণ জলরাশিকে আলাদা ক'রে রাখে। এই বিশাল, উষ্ণ সারগাসো সমুদ্রের অস্তিত্বই ইউরোপের মানুষের পক্ষে উপকারী হয়। এই রকম পরোক্ষ উপায়েই গল্ফ্ স্ট্রীম্ ইউরোপের শীতলতা নিয়ন্ত্রণ করে। এমনও দেখা গিয়েছে, এই স্রোত সাময়িকভাবে যখন বেশী পরিমাণ উষ্ণ জল বহন করে, তখন ইউরোপের আবহাওয়া উষ্ণতর হবার পরিবর্তে শীতলতর হয়।

আর সমস্ত সামুদ্রিক স্রোতের তুলনায় গাল্ফ্ স্ট্রীম্ নিয়ে আলোচনা এবং গবেষণা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। নানাভাবে এই স্রোতকে পরীক্ষা করা হয়েছে। সাধারণ জাহাজ এবং ডুবোজাহাজের ব্যবহার তো হয়েইছে, আধুনিকতর পদ্ধতিও বাদ যায় নি। একটি 'বয়া'কে নির্দিষ্ট গভীরতায় রেখে স্রোতের সঙ্গে তা'কে ভেসে যেতে দেওয়া হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় সে ঐ গভীরতায় ঐ স্রোতের গতিবেগ, দিক্, উষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য পাঠিয়েছে সাগরতলে ভাসমান জাহাজে। জলের নীচে আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি ঘটায় আরও নানা তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছে। কোন্ কোন্ জায়গাতে এই স্রোত একেবারে তলদেশ অবধি পৌঁছোয়, এবং কোন্ অঞ্চলে তলদেশের পলিতে সে কী রকম আলোড়ন তোলে—এসবও জানা সম্ভব হয়েছে আলোকচিত্রের দৌলতে।

একটি উষ্ণ-স্রোতের পরে একটি শীতল স্রোত নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। এর জন্য আমরা বেছে নিচ্ছি বিখ্যাত 'পেরু স্রোত'কে*। চার নম্বর ছবি দেখলেই বোঝা যাবে—এটি এক সুদীর্ঘ স্রোত, যা' দক্ষিণ আমেরিকার

* এই স্রোতের অন্য নাম 'হুম্বোল্ট-স্রোত'—বিশিষ্ট জার্মান প্রকৃতিবিদ্ আলেক্সান্দার ফন্ হুম্বোল্ট্ [Alexander von Humboldt : 1769—1859]-এর নাম অনুসারে। ইনি এই স্রোতের শীতলতা সম্পর্কে পরিমাপ এবং শীতলতার উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন।

গোটা পশ্চিম উপকূল বরাবর বয়ে চলেছে—দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কিন্তু, এর গতি গাল্ফ্ স্ট্রীমের তুলনায় কম, জল পরিবহণের ক্ষমতাও কম (প্রতি সেকেণ্ডে 11,000,000 থেকে 22,000,000 টন), কিন্তু প্রশস্ততা অনেক বেশী (প্রায় সাড়ে পাঁচশো মাইল)। পেরু-স্রোতকে কার্যত দু'টি সমান্তরাল স্রোত ব'লে মনে করা যায়। উপকূল থেকে দূরবর্তী ধারা ঠাণ্ডা হ'লেও নিকটবর্তী ধারা আরও বেশী ঠাণ্ডা। দূরের ধারাটিতে প্রাণীর সংখ্যা খুব বেশী নয়; কাছের শীতলতর ধারার জল মাছের স্বর্গরাজ্য। উপকূলবর্তী দেশ পেরু এক সময়ে মৎস্য-শিকারী দেশদের ভিতরে পয়লা নম্বর-ছিল, যদিও ইদানীং (1973-এর পর থেকে) এই গৌরবময় আসন তা'র আর নেই। এখানে, পেরু-স্রোতের জলে মাছের আধিক্য নিয়ে কিছু বলা দরকার। তা'র আগে অবশ্য বলা উচিত, তীরের কাছের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা স্রোতের উৎপত্তির কারণ হ'ল গভীর থেকে ঠাণ্ডা জল উপরে উঠে আসা। মেরু-অঞ্চল থেকে আসা একটি গভীর ধারা দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর উপরে উঠে আসে। এর ফলে, এই উপকূলের কাছে জল বেশী ঠাণ্ডা এবং দ্রুতগামী হয়। গভীর স্রোতের এইভাবে উপরে উঠে আসার নজীর আরও অনেক অঞ্চলে আছে, এবং এ ধরনের অঞ্চল মাত্রেই মাছের অথবা মাছ-শিকারীর স্বর্গরাজ্য।

সমুদ্রের আসল প্রাণী কিন্তু মাছেরা নয়। সমুদ্রের প্রাণী-জগতের শতকরা নিরানব্বই সংখ্যক সদস্য হ'ল এক ক্ষুদ্র প্রাণিগোষ্ঠী: Plankton, যা'র অর্থ: that which is made to wander। (বাংলায় এদের আমরা 'প্রাণীপঙ্ক' বলতে পারি।) এই প্ল্যাঙ্কটন-সমাজে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবজন্তু অনেক রকমের আছে, সব মিলিয়ে হাজার পনেরো হবে। কিন্তু, আকারে অতি ছোট হবার দরুন এদের অধিকাংশই সাধারণ অণুবীক্ষণেও দেখা দেয় না। প্ল্যাঙ্কটন্ মূলত জলের একেবারে উপরের স্তরেই থাকে; মুক্ত তল থেকে একশো ফুট গভীরতার মধ্যে। রাত্রে এরা আরও অগভীর স্তরে উঠে আসে। এই প্ল্যাঙ্ক্টন্-সমাজের অনেক ছোট সদস্য অনেক বড় সদস্যের প্রিয় খাদ্য, এবং ঐ বড় সদস্যরা আবার ছোট-বড় মাছেদের পেটে ঠাঁই পায়। ছোট মাছেরা আবার অনেক বড় মাছের খাদ্য হয়ে থাকে। এইভাবে সমুদ্রে একটি 'লাইফ্-পিরামিড্' কাজ করে, যে পিরামিডের চওড়া তলদেশে আছে বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র প্ল্যাঙ্ক্টন্, এবং সবচেয়ে উঁচুতে আছে মুষ্টিমেয় বিশাল প্রাণী—তিমি,

ইত্যাদি। কোনো সামুদ্রিক জীব যখন মারা যায়, স্বভাবতই সে ডুবে ডুবে একদম তলায় গিয়ে ঠেকে ; সেখানেই পচে ; আর এভাবেই সমুদ্রের তলায় উৎকৃষ্ট 'সার'-এর পুরু গালিচা গ'ড়ে ওঠে। যখন কোনোও কারণে সমুদ্রের গভীরের জল উপরের স্তরে উঠে আসে, তখন তলার এই 'সার'ও চ'লে আসে উপরের স্তরে। খাদ্যের প্রাচুর্যে ওই অঞ্চলে প্ল্যাঙ্কটনের অবিশ্বাস্য বংশবৃদ্ধি হয় এবং সেই সূত্রে মাছের কল্পনাতীত প্রাচুর্য দেখা দেয়। চিলি এবং পেরুর উপকূলবর্তী সাগরেও এই ঘটনা ঘটেছে। মাছের প্রাচুর্য শুধু মানুষকেই নয়, ধারণাতীত সংখ্যায় সামুদ্রিক পাখীকেও আকর্ষণ করে। কতো পাখী এখানে কতো মাছ খায় তা' এটুকু বললেই আন্দাজ হবে—উপকূল অঞ্চলে এইসব পাখীদের নিক্ষিপ্ত বিষ্ঠা (সার হিসাবে মূল্যবান) চিলি চালান দিয়েছে বছরে দশ লক্ষ টনের উপর—রাসায়নিক সারের যুগ শুরু হবার আগে অবধি।

সামুদ্রিক স্রোত বহু দেশের আবহাওয়া আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে—গালফ্ স্ট্রীমের ক্ষেত্রে আমরা এটা লক্ষ করেছিলাম। পেরু-স্রোত সম্পর্কে এ কথা আরও বেশী খাটে। ইকুয়েডর এবং পেরুর মতো নিরক্ষীয়, উত্তপ্ত দেশের পাশ দিয়ে হিমশীতল ঐ স্রোতের প্রবাহ ঐ সব দেশের আবহাওয়াকে অনেকটা সহনীয় রাখতে চেষ্টা করে। আবার অন্য রকমের একটা প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। তীরগামী বাতাস স্থলভাগে পোঁছোবার আগে ঠাণ্ডা এবং বিস্তৃত পেরু-স্রোতের উপর দিয়ে যায়, যা'র ফলে ঐ বাতাস প্রায় জলশূন্য হয়ে তীরে পোঁছোয়। এর ফলে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পৃথিবীর অন্যতম জলহীন অঞ্চল। কয়েক বছর ধ'রে আদৌ বৃষ্টি না-হওয়া এ অঞ্চলে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। বাতাসের সামান্য জল অনেক সময়ে উঁচু পাহাড়ের গায়ে কুয়াশার মত জ'মে থাকে। সেখানকার মাটি সামান্য জল শুষে নেবার সুযোগ পায়, আর সেইসূত্রে সামান্য সবুজের আভাস দেখা দেয়। অনেক সময়ে একেবারে উল্টো ঘটনাও ঘ'টে যায়। সমুদ্রের স্রোতগুলোর মোটামুটি স্থায়ী গতিপথ থাকা সত্ত্বেও—মূলত বাতাসের স্রোতপথ সাময়িকভাবে বদলে যাবার ফলে—মাঝে মাঝে তা'দের কিছু অস্থায়ী পরিবর্তন ঘ'টে। পানামা উপসাগর অঞ্চলের উষ্ণ জল অনেক সময়ে অনেকটা দক্ষিণে নেমে ঠাণ্ডা পেরু-স্রোতের উপরে আধিপত্য করে। এই সময়ে গভীর থেকে উঠে আসা হিমশীতল জলের প্রবাহও (একটু আগেই যা'র কথা বলা হয়েছে) সাময়িকভাবে

বন্ধ হয়। ফলে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি অঞ্চলে তখন ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে উষ্ণ জলের স্রোত দেখা দেয়। এই রকম ঘটনা গড়ে দশ বছরে একবার ঘটে; কিন্তু যখনই এটা ঘটে—সাধারণত এক্সমাসের সময়ে ঘটে। এক্সমাসের এই আগন্তুককে সুতরাং 'পবিত্র শিশু'র সঙ্গে তুলনা ক'রে [শ্লেষাত্মক ?] এরও নাম রাখা হয়েছে 'এল্ নিনো'—স্প্যানিশ্-ভাষায় যা'র অর্থ 'শিশু'। এই 'এল্ নিনো'-স্রোতের আবির্ভাব দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশের পক্ষেই বিরাট দুর্ভাগ্যবিশেষ*। এর ক্ষতিকর প্রভাব দু' রকম। পেরু-স্রোতের স্বাভাবিক উষ্ণতায় অভ্যস্ত মাছ এই উষ্ণ জলে বাঁচতে পারে না। তা'রা অনেকে মারা পড়ে, অনেকে সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে পালায়। এর ফলে উপকূলবর্তী দেশগুলোর আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হয়। পাখীরা তা'দের খাদ্যের অভাবে বিপুল সংখ্যায় মারা পড়ে। মাছ এবং পাখীর মৃতদেহ পচনের সময়ে যে কটু বাষ্প বা'র হয় তা' ঐ অঞ্চল অতিক্রমকারী জাহাজের রং কালো ক'রে দিয়েছে ব'লে জানা যায়। 1972 সালের 'এল্ নিনো'র প্রভাব হয়েছিল তীব্রতম। এই সময়ে ঐ উপকূলের মাছের যা' ক্ষতি হয় তা' আজ পর্যন্তও আর স্বাভাবিক হ'তে পারেনি, এবং এই ঘটনায় মাছ-ধরা দেশগুলোর ভিতরে পেরুর স্থান এক নম্বর থেকে চার নম্বরে নেমে এসেছে। পাখীর সংখ্যাও এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি।—দ্বিতীয় ক্ষতি আসে আবহাওয়ার দিক থেকে। এল্ নিনোর আধিপত্য চলাকালীন যে বাতাস সমুদ্র থেকে পশ্চিমের ঐ উপকূলে ঢোকে, তা'রা উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে আসে এবং, ফলে, প্রচুর বাষ্প ব'য়ে আনে। এই বাষ্পসমৃদ্ধ বাতাস দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামায়। উদ্ভিদহীন ঐ এলাকা বন্যায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

* 'এল্ নিনো' শুধু একটি স্রোতের নাম নয় : এটি পৃথিবীর বাতাসের প্রধান স্রোত-বিন্যাসের একটি বিপর্যয়—যা' পৃথিবীর প্রায় অর্ধাংশকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে,—কোথাও প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে, কোথাও বা অনাবৃষ্টিতে। ভারতবর্ষও এর ক্ষতিকর প্রভাবের বাইরে নয়।

পাঁচ

সমুদ্র সৃষ্টির এবং বিবর্তনের ইতিহাস এই গ্রহের শৈশবের ইতিহাসের সঙ্গেই জড়ানো। পৃথিবী গ'ড়ে ওঠার পরের ধাপগুলো,—তখন তাপমাত্রা কত ছিল, গঠনের বৈশিষ্ট্য ঠিক কী ছিল, কোন্ ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়া হবার মত অবস্থা তখন ছিল,—এইসব ঠিক ঠিক জানা এখনও সম্ভব হয়নি ব'লে সমুদ্রের জন্ম-কথাও আমাদের এক রকম অজানাই রয়ে গেছে। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত বিপুল মেঘরাশি থেকে বহুযুগের অবিরাম বৃষ্টির ফলে আদি সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল,—এই একান্ত স্বাভাবিক কল্পনা কোনো রহস্যেরই কিনারা করে না। সাগর-সৃষ্টির রহস্যকে মেঘ-সৃষ্টির রহস্যে গোপন করে। অবশ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এখনকার অবস্থায় আদি পৃথিবী এবং সাগরের কোনো ছবিই দাঁড় করানো যায় না—তা' হয়তো নয়। বরং অজ্ঞানের সীমার অভাবে অনেকগুলো ছবিই সমান মর্যাদায় দাঁড় করানো চলে। ভবিষ্যতে এদের কোন্‌টার ভাগ্য কী দাঁড়াবে তা' এখনই আন্দাজ করা সহজ কাজ নয় ; হয়তো সবগুলোই সরিয়ে দিয়ে আপাতত অকল্পনীয় কোনো নতুন কাহিনীর সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাইছি আমাদের এখনকার জ্ঞানের সীমায় সমুদ্র-সৃষ্টির এবং বিবর্তনের,—আনুষঙ্গিক তর্ক বাদ দিয়ে। সংক্ষিপ্ততার কারণ সংক্ষেপে এই যে, আলোচনাটি রসায়নের কিছু নিরস অধ্যায়ে সীমায়িত। সুতরাং এক্ষেত্রে আলোচনা যথেষ্ট বিস্তৃত না হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সমুদ্র-সৃষ্টির রহস্যে আলো ফেলতে হ'লে সবচেয়ে জরুরী হয়ে দাঁড়ায় এই গ্রহের বায়বীয় পরিমণ্ডলের ইতিহাস জানা। পৃথিবী 'সৃষ্টি'র কাজটা ঘটে প্রায় 10^{10} [একের পিঠে দশটি শূন্য] বছর আগে। আকস্মিক সৃষ্টির ধারণা এখন বর্জিত ; পরিবর্তে গৃহীত হয়েছে মহাকাশে বস্তু-কণার আঞ্চলিক সংহতির তত্ত্ব। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি সমৃদ্ধ যে বায়ুমণ্ডলে আমরা অভ্যস্ত, আদি পৃথিবীতে তা'র অস্তিত্ব থাকা নানা কারণে অসম্ভব। আমাদের পরিচিত 'বাতাস' অনেক পরের যুগের অবদান। আদি পৃথিবীর প্রথম গ্যাসীয় পরিমণ্ডল তৈরী হয় পৃথিবীর ভিতরে ঘনত্ব অনুসারে নানা স্তর তৈরীর ঘটনাকে অনুসরণ ক'রে। পৃথিবী সেই শৈশবে প্রায় তরল ছিল ব'লেই ধরতে হবে ; নইলে ভিতরের ঘনত্বভিত্তিক স্তরবিভাগ, ঘূর্ণনের অক্ষ বরাবর চ্যাপ্টা চেহারা—এ সব ব্যাখ্যা করা সহজ হয় না। তরল অবস্থার জন্য কী ঘটনা কতটা দায়ী তা' বলা

শক্ত ; আমাদের আলোচনায় অনাবশ্যকও বটে। কিন্তু, সেই আদি, তরল পৃথিবী থেকেই গ্যাস বা'র হয়ে এসে প্রথম বায়বীয় পরিমণ্ডল তৈরি করেছে। যদিও ঠিক বোঝা যায়নি—কোন্ যুগে কী পরিমাণ গ্যাস পৃথিবী থেকে বা'র হয়েছিল ; অথবা—সুদীর্ঘ কাল ধরেই সমান হারে গ্যাস বা'র হয়ে আসছে কি না। আদি পৃথিবীতে উপরের স্তর বা ত্বকটি যখন কঠিন হয়ে আসছিল, তখন বা'র হয়ে এসেছে সম্ভবত জলীয় বাষ্প ; কার্বনের নানা গ্যাস,—কার্বন ডাই-অক্সাইড্, কার্বন মনোক্সাইড্, মিথেন্ ; সালফারের নানা গ্যাস ; হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বাষ্প—ইত্যাদি। নাইট্রোজেন থাকলেও খুব সামান্য ছিল। অক্সিজেনের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না। সেই অগ্ন্যুৎপাতমুখর যুগে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলোই ছিল নানান গ্যাস উদ্গীরণের প্রধান পথ। এই সব গ্যাস—রাসায়নিক সম্ভাব্যতা অনুসারে—পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া ক'রে পৃথিবীর 'বায়ু-মণ্ডল'কে মিথেনসমৃদ্ধ ক'রে রেখেছিল। এই সঙ্গে সামান্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের অস্তিত্বও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও জলের বাষ্পে অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনা অতি প্রবল। কিন্তু, সামান্য হ'লেও, অ্যামোনিয়া গ্যাসের তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সে সময়ে সূর্য থেকে বিনা বাধায় যথেষ্ট অতিবেগনী রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারতো। এর ফলে জলের বাষ্পে জলের অণু ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন তৈরী হওয়া কঠিন ছিল না। এই 'সালোক বিভাজন' (Photodissociation) ক্রিয়া তখন প্রচুর অক্সিজেন তৈরি করতে পারতো ; কেবল অ্যামোনিয়ার প্রভাবই একে নিষ্ক্রিয় ক'রে রেখেছিল।...কিন্তু, এ তো কেবল ভূ-ত্বক থেকে উঠে আসা গ্যাসের কথা। এটাই সব কিছু নয়। পৃথিবীর গভীর থেকেও প্রচুর গ্যাস বাইরে বা'র হয়ে এসেছে,—ভু-ত্বকের কালক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসে যাদের হিসেব পাওয়া যাবে না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম রুবে (W. W. Rubey)-র খসড়া অনুসারে পৃথিবীর সম্পূর্ণ অতীত কাল ধ'রে বিপুল পরিমাণ গ্যাসীয় জিনিস গভীর স্তর থেকে বাইরের বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পেয়েছে। এদের ভিতরে

জলের মোট পরিমাণ : 16600×10^{20} গ্রাম

কার্বন (কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবে) : 910×10^{20} গ্রাম

নাইট্রোজেন : 42×10^{20} গ্রাম

এবং ক্লোরিন : 300×10^{20} গ্রাম

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, একেবারে আদি পৃথিবীর 'বায়ুমণ্ডল' ছিল মোটামুটি মিথেনসমৃদ্ধ এবং অক্সিজেনহীন। এই অবস্থা কত দিন ছিল তা' বলা শক্ত, পৃথিবীর শরীর থেকে গ্যাস বা'র হবার হার যেহেতু আমরা জানি না। তবে, মাত্র 10^8 (দশ কোটি) বছর ঐ অবস্থা থাকতে কোনো বাধা নেই। পৃথিবীর 'বায়ুমণ্ডলের' এটাই প্রাথমিক অবস্থা, যে অবস্থায় আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশী গ্রহের প্রায় সবাইকেই আসতে হয়েছিল, এবং যে অবস্থায় বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এখনও রয়ে গিয়েছে। পৃথিবী, মঙ্গল এবং শুক্র এই অবস্থা অতিক্রম ক'রে গেছে।

এই প্রাথমিক অবস্থার পরে আস্তে আস্তে দেখা দিল আরেকটা অবস্থা,—যা'কে আমরা মাধ্যমিক অবস্থা বলতে পারি। এই সময়ে হাইড্রোজেনের উৎপাদন কমতে থাকে। তেমনি—হাইড্রোজেন নিতান্ত হাল্কা ব'লেই—অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থের তুলনায় সে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছিল মহাশূন্যে ; অভিকর্ষীয় বল তা'কে তেমন ধরে রাখতে পারছিল না। সব মিলিয়ে, পৃথিবীর 'বায়ুমণ্ডলে' তখন হাইড্রোজেনের ক্রমশ ঘাটতি দেখা দেয়, এবং তা'র ফলে অ্যামোনিয়ার পরিমাণও ক'মে আসে। একটু আগেই যে 'সালোক বিভাজন' ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, সেটা তখন ক্রমশ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে ঃ জলের অণু ভেঙে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন তৈরী হয়। এই হাইড্রোজেনও আবার দ্রুত মহাশূন্যে বিলীন হয়, আর অক্সিজেন প্রথম দিকে খরচা হয়ে যায় নানা রাসায়নিক ক্রিয়ায় ঃ মিথেন, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি জারিত (অক্সিজেন যুক্ত) হয়ে ক্রমশ নিঃশেষ হ'তে থাকে। উদ্বৃত্ত অক্সিজেন বিশেষ কিছুই আর থাকে না।—'বায়ুমণ্ডলের' এই মাধ্যমিক দশায় পৃথিবী কতদিন ছিল, এবং অক্সিজেনের ভাগ তখন কেমন দাঁড়িয়েছিল, এ সব জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়া শক্ত। তবে এখন আমরা বাতাসে যে প্রচুর অক্সিজেন পাই, তা' ঐ মাধ্যমিক অবস্থায় কখনই সম্ভব হয় নি। পরে সবুজ উদ্ভিদে 'সালোক সংশ্লেষণ' (Photosynthesis) প্রচুর অক্সিজেনের জন্ম দিয়ে বায়ুমণ্ডলের সত্যিকার আধুনিক অবস্থার সূচনা করে প্রায় একশো কোটি (10^9) বছর আগে। (লক্ষণীয় ঃ এই প্রাচীনত্ব পৃথিবীর বয়সের সঙ্গেই তুলনীয় ; মোটেই সাম্প্রতিক ঘটনা নয়।) সৌর পরিবারে কেবল পৃথিবী ছাড়া আর কেউ এই অবস্থায় আসতে পারেনি। মঙ্গল আর শুক্র একটা মাধ্যমিক অবস্থাতেই আটকে আছে। সালোক সংশ্লেষণের রাসায়নিক পরিচয় যথেষ্ট জটিল ; সে

আলোচনা এখানে করা হবে না। এটা একটা পদ্ধতি—যা'র সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদ বাতাসের জল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড্ থেকে তাদের খাদ্য তৈরি করে। এর ফলে অক্সিজেনও তৈরী হয়।

এতক্ষণ আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ইতিহাসে আটকে থেকেছি। আমাদের মূল কাজ ছিল সমুদ্র-সৃষ্টির আলোচনা। সমুদ্র-সৃষ্টির জন্য অবশ্য বায়ুমণ্ডলের আধুনিক চেহারার কোনো দরকার ছিল না ; এর আদি দশাতেই আদি সমুদ্রও পৃথিবীতে জায়গা ক'রে নিয়েছে। তবে, এখানেও সঠিক ঘটনাক্রম নিয়ে প্রচুর সন্দেহ আর তর্ক ঃ ঠিক কীসের পরে কী হ'ল—তা' বোঝা যায় না। এইমাত্র আমরা যে আলোচনা করেছি, তা'তে প্রচুর জলীয় বাষ্পের উৎপত্তির কথা আমরা জেনেছি। এই বিপুল বাষ্পই ঘনীভূত হয়ে প্রাথমিক সমুদ্রের জন্ম দেবে—এটা বলা অনাবশ্যক। সেই ঘনীভূত বাষ্প—অর্থাৎ, জল—আদি 'বায়ুমণ্ডলের' নানান অ্যাসিড বাষ্পকেও সঙ্গে নেবার ফলে আদি সমুদ্র কার্যত একটি অ্যাসিড সমুদ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা'তেও সন্দেহ নেই। এই অ্যাসিড্ পৃথিবীর ত্বকের নানা খনিজ জিনিসের বা পাথরের সঙ্গে ক্রিয়া করেছিল তীব্রভাবে। এই-সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তৈরী অধঃক্ষেপই আদি সমুদ্রের তলদেশের ত্বকটি গ'ড়ে তোলে। এর ফলে সাগরের অ্যাসিড্ ব্যবহৃত হয়ে যায় ; উৎপন্ন গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে জমা হয়। রাসায়নিক ক্রিয়াটি তা'হলে দাঁড়াল এই ঃ

আদি আগ্নেয় পাহাড়+অ্যাসিড্ গ্যাস+বাষ্প

→ আদি পলি-পাথর+সমুদ্র+বায়ুমণ্ডল

এই প্রসঙ্গে একটা মূল্যবান কথা মনে রাখা দরকার। দীর্ঘকাল ধ'রেই আমরা ভেবেছি—সমুদ্রে ক্রমশই নানান লবণ জমা হয়ে চলেছে, যেহেতু নদীর জলে ধুয়ে নামছে নানা দেশ-মহাদেশের মাটির লবণ। সমুদ্রের জলের লবণাক্ততা মেপে এক সময়ে পৃথিবীর বয়সও হিসেব করা হ'ত, যেহেতু তখন মনে করা হ'ত—প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে লবণ বেড়ে চলেছে একটা নির্দিষ্ট হারে। সম্প্রতি এই ধারণা বাতিল হয়েছে। নদীগুলো লবণ ঢেলে চলেছে, আর নানা পদ্ধতিতে সেই লবণ জমা হচ্ছে সমুদ্রের তলায়,—এটাই আধুনিক মত। ফলে, লবণাক্ততার বিচারে সমুদ্র স্থির অবস্থায় আছে, এবং আধুনিক ধারণা এই যে, অন্তত গত একশো কোটি বছর ধরে সমুদ্রের জলের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য কার্যত বদলায়নি ; এমনকি—জলের মোট পরিমাণও বেশী

বদলেছে ব'লে আশা করা যায় না। এই দু'টি সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে এই বিশ্বাস যে, বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় জলীয় বাষ্প এবং অ্যাসিড্-গ্যাস পৃথিবীর শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিল তা'র শৈশবেই। এই বিশ্বাস যদি সঠিক না-হয়, অর্থাৎ, পৃথিবীর সম্পূর্ণ অতীত জুড়েই যদি গ্যাসীয় পদার্থ তা'র শরীর থেকে বা'র হয়ে এসে থাকে, তবে অবশ্য সমুদ্রের আয়তনও যুগে যুগে বেড়েছে। তবে, এক্ষেত্রেও, লবণাক্ততার বিশেষ পরিবর্তন হবে না—যদি ঐ সব গ্যাসীয় পদার্থ বরাবর একই অনুপাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সমুদ্রে লবণের পরিমাণ যুগে যুগে ক্রমাগত বেড়ে গেছে—এ ধারণা অবশ্যই ছাড়তে হ'ল, যখন হিসেব ক'রে দেখা গেল—এখন যে হারে সমুদ্রে লবণ ঢালা হচ্ছে, তা'তে মাত্র সোয়া-এক কোটি বছরেই সাগরে লবণের পরিমাণ এখনকার মত হয়ে যায়। অথচ, সমুদ্র যে এর চাইতে প্রায় একশো গুণ বেশী পুরোনো, তা'তে সন্দেহ নেই। অতএব, সমুদ্রের জল যখন বাষ্প হয়, তখন সমুদ্রে লবণের ঘনত্ব নিছক বেড়ে যায় না, বরং কিছুটা লবণ নানা খনিজের রূপে জল থেকে কোনোভাবে বা'র হয়ে যায়।—এই চিন্তাধারায় গত কুড়ি বছরে মূল্যবান গবেষণা হয়েছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে,—সমুদ্রের জল তা'র ধারণের নানা উপাদান নিয়ে বায়ুমণ্ডলের বর্তমান চাপে একটা রাসায়নিক সাম্য খুঁজে পেয়েছে। এখন যদি সমুদ্রে ঐ সব জিনিস আরও ঢালা হয়ও, তবু ঐ জলের সাংগঠনিক পরিবর্তন আর হবে না। (তবে, কোনো একটি বিশেষ উপাদানের অতি সংযোজন হয়তো এখনকার সাম্য নষ্ট করতে পারে।) সঠিক কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বাড়তি উপাদান বহিষ্কৃত হয় (বা সাগরের নিচে নিক্ষিপ্ত হয়) তা' এখনও ভালোভাবে বোঝা যায়নি। বহুসংখ্যক রাসায়নিক ক্রিয়া-কাণ্ডই বোধহয় এর জন্য দায়ী। নদীর জল যখন প্রচুর উপহারের সম্ভার নিয়ে সাগরের জলে এসে মেশে, তখনই বোধহয় ঐ সব রাসায়নিক ক্রিয়াগুলো হয়। তবে, এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে, সমুদ্রের জল তা'র ধারণের উপাদানগুলোতে সম্পৃক্ত (saturated) হয়ে গিয়েছে, এবং সেই কারণেই ঐ সব উপাদান সেখানে আরও যুক্ত হওয়া অসম্ভব। ক্যালসিয়াম কার্বনেট্-এর মত এক-আধটি উপাদানে সাগরের জল সম্পৃক্ত হলেও অধিকাংশ মূল উপাদানে সে মোটেই সম্পৃক্ত হয়ে যায়নি। সাধারণভাবে বলা যায়, এখন সমুদ্রের জলে যে পরিমাণ লবণ আছে, তা'র দ্বিগুণ লবণও থাকতে কোনো বাধা ছিল না।

ছয়

ঠিক আগের পরিচ্ছেদে সমুদ্রের উৎপত্তি নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদের আলোচনায় সমুদ্রকে আমরা খুব কাছে থেকে দেখব; সম্পূর্ণ সাগরমালাকে না-দেখে আমরা তা'র খানিকটা জল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখব—তা'তে কী আছে; কীই বা তা'র ধর্ম!—এ আলোচনা মূলত তথ্যবহুল; অতএব খানিক নিরস না-হয়ে যায় না। কিন্তু, আলোচনার পূর্ণতা রক্ষার্থে এটুকু মেনে নিতে হবেই। সমুদ্রের জলকে বাদ দিলে তা'র অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে।

সাগরের জলের 'গঠন' সম্পর্কে আগের পরিচ্ছেদে একটা প্রাথমিক ধারণা আমাদের হয়েছে। (জলের গঠন বলতে এখানে কেউ যেন আণবিক গঠনের কথা না-ভাবেন। ঐ জলে কী কী জিনিস আছে, তা'ই আমরা বোঝাতে চাই।) এখানে তা'র পূর্ণতর পরিচয় প্রথমেই পাওয়া দরকার। অদ্রবীভূত অবস্থায় যা' থাকে, তা' নিয়ে আলোচনা ক'রে তেমন লাভ নেই। কারণ, ওসব জিনিস নদীর জলের তোড়ে সমুদ্রে এসে পড়লেও অতি দ্রুত তলায় গিয়ে ঠেকতে থাকে; গোটা সমুদ্রের জলে ছড়াবার সুযোগ পায় না; সমানভাবে ছড়ানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব, সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় কী কী থাকে সেটাই দেখা বিশেষ দরকারী। জৈব এবং অজৈব—দু'রকমের জিনিসই জলে দ্রবীভূত থাকে। জৈব পদার্থগুলো অবশ্যই আসে নানা প্রাণীর মৃত শরীর থেকে। বৃহৎ আকারের তিমি কিংবা হাঙ্গর থেকে শুরু করে অতি ছোট চেহারার কত অসংখ্য প্রাণী প্রতিদিনই সমুদ্রে মারা পড়ে, তা'র ইয়ত্তা নেই।

দ্রবীভূত অজৈব পদার্থের সংখ্যা প্রচুর। গ্যাসের কথাই প্রথমে ধরা যাক। সমুদ্র যেহেতু মুক্ত বায়ুমণ্ডলের স্পর্শ সব সময়েই পাচ্ছে, বাতাসের সব গ্যাসই সমুদ্রের জলে কিছু কিছু আছে, যদিও বাতাসে যে অনুপাতে আছে সেই অনুপাতে নয়। কারণ, সব গ্যাসের দ্রাব্যতা সমান নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে বেশী না-থাকলেও জলে তা'র উপস্থিতি আনুপাতিকভাবে বেশী,—কারণ, জলে সে সহজেই গুলে যেতে পারে। বাতাসে নাইট্রোজেন খুব বেশী; অক্সিজেনও নেহাৎ অল্প নয়। সমুদ্রের জলেও এরা যথেষ্টই হাজির; তবে

আনুপাতিকভাবে অত বেশী নয়। তাহলেও অবশ্য সমুদ্রের জলেও ঐ তিনটি গ্যাসের ভিতরে নাইট্রোজেন আছে সবচেয়ে বেশী ; অক্সিজেন কম ; কার্বন ডাই-অক্সাইড্ আরও কম। অনুপাত কত হবে তা' এক কথায় বলা যায় না। গ্যাসের দ্রাব্যতা নির্ভর করে উষ্ণতা, চাপ ও আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর। সুতরাং দ্রবীভূত গ্যাসগুলোর অনুপাতের আঞ্চলিক তারতম্য থাকে। বেশী চাপে বেশী গ্যাস, এবং বেশী উষ্ণতায় কম গ্যাস দ্রবীভূত হয়।

গ্যাস বাদে অন্যান্য অজৈব পদার্থের উপস্থিতি অনেক বেশী। প্রথমেই বলতে হয় সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডের কথা। অন্যান্য সমস্ত লবণের তুলনায় এর প্রচুরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লবণ সমুদ্রের জলে কতখানি আছে, তা' বলার আগে আরেকটি কথা ব'লে নেওয়া দরকার। সোডিয়াম ক্লোরাইড্ বা NaCl জলে যখন গ'লে যায়, তখন এই অণু বিদ্যুৎবাহী দু'টি কণা বা ion-এ ভেঙে যায় ঃ Na^+ এবং Cl^-। অন্য লবণের ক্ষেত্রেও একই রকমের ঘটনা। সমুদ্রের জলে Cl^- আয়নের ষোলো আনাই যে NaCl-এর জন্যই হবে, তা' নয়। কারণ, অন্য কোনো ক্লোরাইড্ লবণ থেকেও Cl^- আসতে পারে। সমুদ্রের জলে কী কী আছে, এ হিসেব দেবার সময়ে আজকাল সাধারণত কত গ্রাম্ জলে কোন্ আয়ন কত গ্রাম্ আছে সেই হিসেবই দেওয়া হয়,—কোন রাসায়নিক যৌগ কতটা আছে—তা' বলা হয় না। এ-হিসাবে বলা যায় ঃ সমুদ্রের জলে সোডিয়াম্ এবং ক্লোরিন আয়নেরই প্রাধান্য। এরা দু'টোতে মিলে সমস্ত দ্রবীভূত লবণের শতকরা পঁচাশি ভাগ (ওজনের হিসাবে)। (এ ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক তারতম্যের কথা মনে রাখতে হবে।) নীচে আমরা প্রধান উপাদান-গুলোর উপস্থিতির একটা হিসাব দিয়ে দিলাম। এখানে অবশ্য শতকরা হিসাবের মধ্যে না-গিয়ে সম্পূর্ণ পরিমাণের কথাই বলা হয়েছে। পাশাপাশি আরেকটা স্তম্ভে দেখানো হয়েছে প্রতি বছরে নদীগুলো সমুদ্রে কতটা কী বয়ে আনে—তা'র পরিমাণ।

উপাদান*	সমুদ্রে মোট পরিমাণ (10[20] গ্রামের এককে)	নদীপথে প্রতি বছর কতখানি বস্তু সমুদ্রে এসে পড়ে, তা'র পরিমাণ (10[14] গ্রামের এককে)
Cl^- [ক্লোরিন] ...	261	... ... 2·54
Na^+ [সোডিয়াম] ...	144	... ... 2·07
$(SO_4)^{--}$ [সালফেট্] ...	37	... ... 3·67
Mg^{++} [ম্যাগনেসিয়াম] ...	19	... ... 1·33
Ca^{++} [ক্যালসিয়াম্] ...	6	... ... 4·88
K^+ [পটাসিয়াম] ...	5	... ... 0·74
SiO_2 [সিলিকা] ...	0·08	... ... 4·26
$(HCO_3)^-$ [বাই কার্বনেট] ...	1·9	... ... 19·02
জৈব পদার্থের কার্বন ...	0·007	... ... 3·2
Fe^{++} [লোহা] ...	0·0000137	... ... 0·223

এই তালিকা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। আরও সামান্য উপস্থিতি নিয়ে আরও সদস্য হাজির থাকে—যা'দের নাম এই তালিকায় নেই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এই তালিকা পূর্ণতর হ'লে লোহার পরেই অ্যালুমিনিয়ামের নাম করতে হ'ত। খুবই নগণ্য পরিমাণে আয়োডিন এবং তামাও রয়েছে সমুদ্রের জলে। তেজস্ক্রিয় পদার্থও একেবারে অনুপস্থিত নয়। কিন্তু, এই উপাদান-প্রসঙ্গ শেষ করার আগে এই বিষয়ে একটি বিকল্প তালিকাও এখানে দেওয়া হচ্ছে, যাঁরা

* এই তালিকার বন্ধনীর ভিতরে ধাতুর নাম উল্লেখ করা হ'লেও আসলে ঐ ধাতুর আয়নকেই বোঝানো হয়েছে। সিলিকা [SiO_2] কোনো আয়ন না-হ'লেও, জলে সিলিকেট্ হিসাবে এর উপস্থিতি গণ্য হয়ে থাকে।

উপরের আয়নীয় তালিকায় স্বস্তিবোধ করবেন না, তাঁদের জন্য। এই তালিকায় লবণের সুপরিচিত এবং সম্পূর্ণ নামগুলো ব্যবহার করা হ'ল।

উপাদানের / লবণের নাম			সমুদ্রের এক কিলোগ্রাম জলে কত গ্রাম আছে
সোডিয়াম ক্লোরাইড্ [$NaCl$]	...	...	23·48
ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড্ [$MgCl_2$]	...	...	4·98
সোডিয়াম সালফেট্ [Na_2SO_4]	...	...	3·92
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড্ [$CaCl_2$]	...	...	1·10
পটাসিয়াম ক্লোরাইড্ [KCl]	...	...	0·66
সোডিয়াম বাইকার্বনেট্ [$NaHCO_3$]	...	...	0·19
পটাসিয়াম ব্রোমাইড্ [KBr]	...	...	0·10
বোরিক অ্যাসিড্ [H_3BO_3]	...	...	0·03
স্ট্রন্‌সিয়াম্ ক্লোরাইড্ [$SrCl_2$]	...	...	0·02
			মোট ঃ 34·48 গ্রাম

এই হিসেবটা একটা প্রমাণ হিসেব। তবে, সর্বত্র এ হিসেব সমানভাবে সত্য হ'তে পারে না ; আঞ্চলিক তারতম্য থাকবেই।...উপাদান-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে আমরা এখন আসব সমুদ্রের জলের কয়েকটি বিশিষ্টতার আলোচনায় ; যদিও রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাব না।

* * *

সমুদ্রের জলের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা'র লবণাক্ততা। প্রতি কিলোগ্রাম এই জলে সাধারণত 34 থেকে 37 গ্রাম লবণ থাকে—সব রকমের লবণ মিলে, যদিও সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডেরই সেখানে প্রাধান্য। কিন্তু, সমুদ্রের সর্বত্র মোটামুটিও এক রকমের লবণাক্ততা থাকে না। নানা প্রাকৃতিক কারণে এর বিরাট তারতম্য হ'তে দেখা যায়, এবং এর সমীক্ষাটি বেশ চিত্তাকর্ষক। সাধারণত, যেখানে বৃষ্টিপাত খুব বেশী এবং / অথবা মিষ্টি জলের (নদীর জলের) প্রচুর যোগান আছে, সে অঞ্চলে সমুদ্রের জলে লবণের ঘাটতি থাকবেই। যদি সমুদ্রের ঐ রকম কোনো এলাকা পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রমালা থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে তা'তে লবণের ভাগ আরও কম হয়, যেহেতু চারপাশে সমুদ্রের জলের স্বাভাবিক, লবণাক্ত স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত হয়। উত্তর ইউরোপের বাল্টিক

সাগর এর একটি চমৎকার উদাহরণ। এই আবদ্ধপ্রায় সাগরের সঙ্গে বাইরের সমুদ্রমালার যোগ সামান্য ; অথচ এই সাগরে বিস্তর ছোট-বড় নদী এসে পড়েছে। এই সমুদ্রের এক কিলোগ্রাম জলে মাত্র দশ গ্রাম লবণ থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং এই সমুদ্রের ভিতর প্রান্তে (সুইডেন ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী) বোথ্‌নিয়া উপসাগর এবং (ফিন্‌ল্যাণ্ড্‌ ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী) ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে ওই পরিমাণ পাঁচ গ্রামেও এসে ঠেকে। ঠিক এর উল্টো উদাহরণ ভূমধ্যসাগর। এখানে নদীর জল যা' আসে, তা'র চেয়ে বাষ্প হয়ে বেশী জল খরচ হয়ে যায়। বাইরের সমুদ্র থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ব'লে এই সমুদ্রের সঙ্গে অন্যান্য সমুদ্রের জলের স্বাভাবিক মেলামেশা হবার উপায় নেই। জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে বাইরের জল ঢুকতে পারে—এই পর্যন্ত। এখানে তাই লবণের ভাগ বেশী। আবার অনেক সময়ে দেখা যায়, যেখানে বড় বড় নদী এসে সাগরে মেশে, সে অঞ্চলের উপর দিকের জলে লবণের ভাগ কম, যেহেতু নদীর হাল্কা জল উপরের দিকেই থাকতে চায়। কোনো কারণে এখানে হয়তো জলের স্বাভাবিক মিশ্রণ হয়ে ওঠে না।...কিন্তু এ জাতীয় উদাহরণ সাধারণত সাগরের কিনারেই থাকে, মুক্ত সমুদ্রের বুকে নয়। মুক্ত সাগরে লবণাক্ততা প্রায় পুরোপুরি নির্ধারিত হয় বৃষ্টিপাতে জল যোগ এবং বাষ্প হয়ে জল-বিয়োগ—এই দুয়ের প্রতিযোগিতায়।

*   *   *

লবণাক্ততার পরেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমুদ্রের জলের ঘনত্ব। বলাবাহুল্য, ঘনত্ব লবণের পরিমাণের উপরে নির্ভরশীল হ'তে বাধ্য। বিশুদ্ধ জলের ঘনত্ব, সাধারণ চাপে এবং $0^{\circ}C$ উষ্ণতায়, 1 গ্রাম/ঘন সেণ্টিমিটার। আর যদি এক কিলোগ্রাম জলে 20 গ্রাম বা 35 গ্রাম লবণ থাকে, তবে ঘনত্ব দাঁড়ায় যথাক্রমে 1·016 বা 1·028 গ্রাম/ঘন সেণ্টিমিটার। এ থেকে সমুদ্রের জলের ঘনত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা হবে। বলা অনাবশ্যক, চাপ বাড়লে জলের ঘনত্ব বাড়ে, এবং উষ্ণতা বাড়লে ঘনত্ব সাধারণত কমে। জলের উষ্ণতার সঙ্গে ঘনত্বের সাধারণ সম্পর্ক অনেকেরই নিশ্চয় জানা আছে। বিশুদ্ধ জল $4^{\circ}C$ উষ্ণতায় সব চাইতে ঘন ; আরও ঠাণ্ডা হ'লে ঘনত্ব কমবে। কিন্তু সমুদ্রের লবণাক্ত জলের বেলাতে ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় আরও ঠাণ্ডায় ; সাধারণত শূন্য ডিগ্রীর উপরে নয়।

এই কারণে সমুদ্রের নোনা জলের উপরে বরফ জমা অতটা সহজ হয় না, যতটা সহজ হয় পুকুর বা হ্রদের বেলায়। আবহাওয়া যখন ঠাণ্ডা হ'তে থাকে, হ্রদের জলের উপরের অংশ সেই সংস্পর্শে থাকায় একই মাত্রায় ঠাণ্ডা হয়। 4°C উষ্ণতায় এসে উপরের জল সবচেয়ে ভারী হয়ে নীচে চ'লে যায়। আরও ঠাণ্ডা হ'লে জলের ঘনত্ব ক'মে যাওয়ায় সে উপরেই থাকে, এবং ক্রমশ আরও বেশী ঠাণ্ডা হয়ে বরফ হয়ে যায়। এইভাবে হ্রদের উপরে বরফের স্তর গ'ড়ে ওঠে, কিন্তু গভীরে তখনও জল উষ্ণতর থেকে যায়। বাতাস আরও ঠাণ্ডা হ'লেও বরফের আস্তরণ ভিতরের জলকে আড়াল ক'রে রাখে। সমুদ্রে কিন্তু এটি হবার উপায় নেই, যদি সেখানে লবণাক্ততা স্বাভাবিক থাকে। এক্ষেত্রে কেবল উপরের স্তর 0°C উষ্ণতায় এলেই হবে না, সম্পূর্ণ জলরাশিকেই এই উষ্ণতায় আসতে হবে,* এবং এটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। অনেক সময়ে তীব্র ঠাণ্ডার এলাকায় সমুদ্রের বুকে বিশাল বরফের চাঁই ভাসতে দেখা যায়। এগুলো সাধারণত মেরু-অঞ্চল থেকে ভেসে আসা বরফ।...যাইহোক, আবার ঘনত্ব-প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এইমাত্র বলা হয়েছে, চাপ বাড়লে জলের ঘনত্ব বাড়ে। কথাটা মিথ্যা নয়; কিন্তু, এই বৃদ্ধির পরিমাণ সামান্য। কারণ, জলকে চাপ দিয়ে বিশেষ ছোট করা যায় না। তবু, সমুদ্রের গভীরে জলের চাপ প্রচণ্ড ব'লে ঘনত্বের পরিবর্তনটুকু সহজেই পরিমাপযোগ্য। সাগরের মুক্ত তলে জলের ঘনত্ব যদি 1·028 গ্রাম/ঘন সেণ্টিমিটার হয়, তবে এক হাজার মিটার বা 3280 ফুট গভীরে ঘনত্ব 1·033 গ্রাম/ঘন সেণ্টিমিটার; এবং দশ হাজার মিটার বা 32800 ফুট গভীরে ঘনত্ব 1·071 গ্রাম/ঘন সেণ্টিমিটার। (লবণের উপস্থিতির কোনো অদ্ভুতত্ব এক্ষেত্রে নেই ব'লে ধরা হ'ল।)

* * *

ঘনত্ব-প্রসঙ্গের পরেই আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা। এ ব্যাপারেও আঞ্চলিক (এবং গভীরতাভিত্তিক) তারতম্য ঘটবে—এটা সহজেই

---

* আসলে 0°C-এর চেয়েও কম তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। সমুদ্রের জলে লবণের উপস্থিতির জন্য 0°C-এ ঐ জল বরফ হ'তে পারে না। এক কিলোগ্রাম জলে দশ গ্রাম লবণ থাকলে হিমাঙ্ক হয় 0°C-এর পরিবর্তে −0·53°C, এবং 35 গ্রাম লবণ থাকলে হিমাঙ্ক আরও নেমে হয়ে যায়, −1·91°C।

আন্দাজ করা যায়। পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলের সাগরে এক-এক রকমের তাপমাত্রা, তা'ও আবার ঋতু পরিবর্তনে বদলায়। সমুদ্রের মুক্ত তলের তাপমাত্রাতেও আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাট। 0°C-এর কম থেকে শুরু ক'রে 30°C-এর বেশী অবধি সব কিছুই হ'তে পারে। তবে সাধারণত এই তাপমাত্রার পরিবর্তনের হার অল্প। খুব কম উদাহরণ আমাদের জানা আছে—যেখানে অল্প দূরত্বেই তাপমাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। অবশ্য, এমন বিরল দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে একটি নৌকোয় চ'ড়ে দু'দিকের জলে দু'হাত ছোঁয়ালেও উষ্ণতার তফাত স্পষ্ট বোঝা যায়।

গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে সরল ; কিন্তু, একেবারে জটিলতামুক্ত নয়। সাধারণত গভীরতা বাড়লে জলের উষ্ণতা কমে, যদিও মেরু-অঞ্চলে এর বিপরীত ঘটনাই লক্ষ করা যায়। একেবারে উপরের স্তরে তাপমাত্রা অবশ্য একই থাকে—গভীরতা-নিরপেক্ষ হয়ে। বাতাসের ধাক্কায় জলের উপরের স্তরে যে আলোড়ন ওঠে, তা'তে মিশ্রণের কাজটা ঐ স্তরে খুব ভালোভাবে হয়। সুতরাং, উষ্ণতার তফাত তেমন ঘটতে পারে না। এরপর থেকে জল আরও নীচে ক্রমশ ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। খুব গভীরের জল খুবই ঠাণ্ডা। পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডলের সমুদ্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না, এবং ষোলো হাজার ফুট নীচে 1°C উষ্ণতা কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয়।—সাধারণভাবে বলতে গেলে গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার সম্পর্ক এই রকমই। বিশেষক্ষেত্রে কিছু অদ্ভুত ঘটনা দেখা যেতে পারে ; কিন্তু, এখানে আমরা তা' নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।

* * *

সমুদ্রের জলের আরও অজস্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়, আপাতভাবে যাদের নিতান্ত নিরস মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ জাতীয় আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। তবে, পরপৃষ্ঠার সারণীতে কয়েকটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করা হ'ল বিনা আলোচনায়। সমস্ত ফলাফলই সমুদ্রের উপরের তল বা মুক্ত তল-এ প্রযোজ্য ; গভীর স্তরে নয়। লবণাক্ততা—ধরা হয়েছে—প্রতি কিলোগ্রাম জলে পঁয়ত্রিশ গ্রাম। পরের পৃষ্ঠার বৈশিষ্ট্যগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উল্লেখ না ক'রে চারটি ভিন্ন উষ্ণতায় উল্লেখ করা হ'ল।

ধর্ম	0°C-এ	10°C-এ	20°C-এ	30°C-এ
ঘনত্ব [একক ঃ গ্রাম/ঘন সে. মি.]	1·0282	1·0269	1·0249	1·0221
শব্দের গতি [একক ঃ মি./সেকেন্ড]	1449·4	1490·1	1521·7	1545·7
আপেক্ষিক তাপ [একক ঃ ক্যালোরি/গ্রাম/°C]	0·953	0·954	0·955	0·956
বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ($\times 10^3$) [একক ঃ /ও'ম্/সে. মি.]	29·04	38·10	47·92	58·35
(তাপীয়) আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক ($\times 10^{-5}$) [একক ঃ /°C]	5·4	16·6	25·8	33·4
(আণবিক) তাপ পরিবাহিতাঙ্ক ($\times 10^3$) [একক ঃ ক্যালোরি/সে.মি./সেকেন্ড/°C]	1·27	1·31	1·35	1·38

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে সমুদ্রের জলের রং সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা যায়।—সূর্যের আলো যখন সমুদ্রের বুকে এসে পড়ে, তখন জলের অণুতে ঐ আলোর বিচ্ছুরণ (scattering) হয়। এইসঙ্গে আর কোনো ঘটনা যদি না ঘটে, তবে সাগরের জল দেখতে নীল হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে—বিশেষত, মধ্য- ও নিম্ন অক্ষরেখার অঞ্চলে—তা'ই হয়েও থাকে। কিন্তু, অনেক জায়গায় উপরের স্তরে অনেক আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের অত্যধিক উপস্থিতির জন্য একটি হলুদ আভা বাড়তি রং হিসাবে দেখা দেয়। স্থানবিশেষে ঐ হলুদের তীব্রতার সঙ্গে মূল নীল রং-এর মিশ্রণে চূড়ান্ত রংটি তৈরী হয়, এবং এর ফলে সাগরের জল নীল, সবুজ বা হলুদের নানা রূপ নিতে পারে। ক্বচিৎ অজৈব, রঙিন বস্তু-কণার উপস্থিতিও রং-এর চূড়ান্ত রূপ নির্দেশ ক'রে দেয়।

সাত

সমুদ্রের কাছে মানুষ নিছক ঋণী নয়, মানুষের অস্তিত্বই সম্ভব হয়েছে সমুদ্রের জন্য। প্রাণী প্রথম দেখা দিয়েছিল সমুদ্রেই, এবং তারপর থেকে সমুদ্র অবলম্বন করেই জটিলতর এবং উন্নততর প্রাণীরা দেখা দিয়েছে অনেক যুগ অবধি। সামগ্রিকভাবে এ কথা অনায়াসে বলা যায়—সমুদ্র না-থাকলে আজকের দৃশ্যমান প্রাণী-জগৎ একেবারেই অন্য রকমের হ'ত। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় সমুদ্রের সবচেয়ে বড়ো দান পৃথিবীর জমিতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা। সূর্যের তাপে সমুদ্র স্থলভাগের মতো দ্রুত গরম হয় না; তা'র উপরের বাতাসও মধ্যম উষ্ণতায় থাকে। এর ফলেই স্থলভাগের বহু অঞ্চল মরুভূমি হয়ে যেতে পারেনি। সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃতি জুড়ে যে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পই মেঘ হয়ে বহু অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করে।

সমুদ্র মানুষের খাদ্যেরও বিশাল ভাণ্ডার। মানুষ প্রতি বছর সমুদ্র থেকে মাছ তোলে ছ'কোটি টন। কিন্তু, এটাও তেমন কিছু নয়। সমুদ্রের দেবার ক্ষমতা অনেক বেশী; মানুষ এখনও ঠিকমত নিতে পারছে না। এখন পর্যন্ত মানুষ সমুদ্র থেকে খুব একটা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে না; এবং রুচি অনুসারে কেবল নির্বাচিত কয়েকটি মাছই সংগ্রহ করে ব'লে সংগ্রহের পরিমাণও তেমন কিছু হ'তে পারে না। সমুদ্রের কাছ থেকে আরও প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমরা পেতে পারি, যদি আমাদের অভ্যাস এবং সংস্কার কিছু বদলানো যায়। সমুদ্রের ভাণ্ডারে মানুষের খাদ্য মানেই 'মাছ', এবং মাছ মানেই স্যামন্, ম্যাকেরেল্, টুনা, হেরিং ইত্যাদি কিছু কুলীন প্রজাতি—এই সংস্কারের অবসান দরকার। ডাঙার বহু উদ্ভিদকে যেমন আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি, জলজ উদ্ভিদকে সেভাবে বিবেচনা করিনি। খাদ্যাভ্যাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে যে দেশ সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে—সে হ'ল জাপান, আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। অবশ্য, সমুদ্রের অধিকাংশ উদ্ভিদই 'প্ল্যাঙ্ক্টন্' এবং তা' আণুবীক্ষণিক—এ কথা আমরা আগেও বলেছি। সমুদ্রের বিশাল আয়তনে ছড়িয়ে থাকার দরুন এদের সংগ্রহ এবং ব্যবহার করবার কথা এখনও ভাবা যায়নি। কিন্তু বড় আকারের উদ্ভিদও মানুষ ব্যবহার করে না

কেবল অনভ্যাসবশত। জাপান প্রতি বছরে বহু হাজার টন সামুদ্রিক উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, এবং 'সীউঈড্ গার্ডেন্'-এ রীতিমতো চাষও করে। শুধু খাদ্য হিসেবেই নয়, জমির সার হিসেবেও এই উদ্ভিদের প্রয়োগ এখন সুবিদিত। মাছের প্রসঙ্গে বলতে হয়—জাপান এখন কোনো মাছ খেতেই বাকী রাখে না। তাদের খাদ্য-তালিকায় 'স্কুইড্' এবং অক্টোপাস্ পর্যন্ত সম্মানজনক স্থান নিয়েছে। কোনো কোনো বছরে জাপান এই অক্টোপাস এবং সমজাতীয় প্রাণী গ্রহণ করেছে কয়েক হাজার টন, এবং এইসব প্রাণী থেকে তা'রা জনপ্রিয় কয়েকটি রান্না আবিষ্কার করেছে। কিন্তু, পশ্চিমী দেশরা অন্য অনেক বিষয়ে জাপানকে ঈর্ষা করলেও খাদ্য নির্বাচনে তাদের উদারতাকে এখনও প্রশ্রয় দিতে শেখেনি। অবশ্য, পশ্চিমের—বিশেষত, রাশিয়ার—এখন দৃষ্টি পড়েছে 'অ্যান্টার্ক্‌টিক্ ক্রিল্'-এর দিকে। এই চিংড়িজাতীয় প্রাণীরা আকারে বেশী বড় হয় না ; সাধারণত এক থেকে দুই-আড়াই ইঞ্চির ভিতরেই থাকে ; এবং এদের একাংশ তিমিমাছের খাদ্য হিসেবে প্রাণ উৎসর্গ ক'রে থাকে। কিন্তু এরা সমুদ্রের সীমিত এলাকাতে অকল্পনীয় পরিমাণে রয়েছে। যদিও মোট পরিমাণ সম্পর্কে তর্কাতীত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি ; তবু—সবাই স্বীকার করেন— বছরে দশ কোটি টন এই চিংড়ি পেতে কোনো বাধা নেই ; এবং এই পরিমাণ—অন্যান্য সমস্ত মাছ সংগ্রহের বাৎসরিক পরিমাণের সঙ্গেই তুলনীয়। সব মাছই মানুষের রুচিতে গ্রাহ্য হওয়া হয়তো সহজ ব্যাপার নয় ; কিন্তু, এরও প্রতিকারের পথ আছে। মাছকে মাছ হিসেবেই না-খেয়ে তা' থেকে কোনো উন্নত উপায়ে প্রোটিন বা'র ক'রে রাখা যেতে পারে। এখনও এই পথে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি যথেষ্ট হয়নি ; কিন্তু হওয়া দরকার। হিসেব থেকে আরও দেখা যায় ঃ একজন মানুষের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে খরচ হওয়া উচিত ষোলো পয়সারও কম। কিন্তু, এর জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা হওয়া যেমন জরুরী, মানুষের খাদ্য-রুচির কিছুটা পরিবর্তনও তেমন দরকার। বিশেষজ্ঞের হিসেব মতে, সমুদ্র থেকে আমাদের প্রতি বছরই দু'শো কোটি টন খাদ্য পাওয়া উচিত,—ভবিষ্যতের ক্ষতি না-ক'রেও।

সামুদ্রিক মাছের অন্য এক লাভজনক ব্যবহারের রীতি কিন্তু অগ্রসর দেশ-গুলোতে যথেষ্ট প্রবল, এবং ক্রমশই তা' প্রবলতর হচ্ছে। যে সব মাছ এখনও মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠেনি, সে সব মাছেরও প্রচুর চাহিদা রয়েছে ইতর প্রাণীদের

খাদ্যের উপকরণ হিসেবে। এই মৎস্যঘটিত খাবার মূলত হাঁস-মুরগীর জন্যই তৈরি করা হয়, যদিও টার্কি, শুয়োর ইত্যাদিও বাদ যায় না। 1974 সালেই যুক্তরাষ্ট্রে তিনশো আটষট্টি হাজার টন সামুদ্রিক মাছ ব্যবহার করা হয় পশু-খাদ্য তৈরির জন্য। এই খাদ্য নাইট্রোজেন এবং ফস্‌ফোরাস সমৃদ্ধ ব'লে এর ব্যবহারে খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। তা'ছাড়া সাধারণ শস্যঘটিত খাবারে যে তিনটি দরকারী অ্যামিনো অ্যাসিড সাধারণত কম থাকে, মৎস্যঘটিত খাবারে তা'ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই জাতীয় খাবারের ব্যবহার কী দ্রুত-গতিতে বাড়ছে, তা' উৎপাদনের হার থেকেই স্পষ্ট হবে। 1954, 1964 ও 1974 সালে সারা পৃথিবীতে এর উৎপাদন ছিল যথাক্রমে 995,000 টন, 3,660,000 টন এবং 4,430,000 টন।

মাছ ধরার কাজে বর্তমানে জাপানই বোধহয় সবচেয়ে অগ্রণী ; তবে, অন্য অনেক দেশও এ কাজে এগিয়ে আছে। একেবারে সাম্প্রতিক হিসেব আমাদের হাতে নেই। তবে, 1971-75 সালের গড় হিসেব অনুসারে জাপান মাছ ধরেছে [তিমি শিকার বাদ দিয়ে] বছরে 10·75 মিলিয়ন মেট্রিক টন। [এক মিলিয়ন = দশ লক্ষ ; এক মেট্রিক টন = 1000 কিলোগ্রাম, বা 0·984 টন।] অন্যান্য কয়েকটি দেশের হিসেব ছিল এই রকম ঃ রাশিয়া 9·75, চীন 7, পেরু 5·25, নরওয়ে 3, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 3 এবং ভারত 2·25 মিলিয়ন মেট্রিক টন। অনেক দেশ এই কাজে ক্রমশ নিরুৎসুক হয়ে পড়ছে ; কারণ, প্রায়ই সমুদ্রের পথে বহুদূর পাড়ি দিতে হয়—মৎস্যবহুল অঞ্চলে। অনেক খরচ হয়ে যায় তা'তে। কিন্তু, এক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক সমাধান সম্ভব হ'তে পারে। মাছের প্রিয় অঞ্চলে আমাদের পাড়ি দেবার দরকার নেই ; বরং আমাদের সুবিধাজনক অঞ্চলেই যা'তে মাছ আসে—সে ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই করা সম্ভব হ'তে পারে। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে এর একটা ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। যে অঞ্চলে সমুদ্রের তলা থেকে প্ল্যাঙ্ক্‌টনের খাদ্য উপরে উঠে আসে ঊর্ধ্বগামী জলের সঙ্গে, সেখানেই দেখা দেয় মাছের প্রাচুর্য। এ ঘটনা যেখানে ঘটে সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপে এর কৃত্রিম আয়োজনের কথাও ভাবা হচ্ছে। অগভীর সমুদ্রের তলায় যদি তাপ উৎপাদনের কোনো ব্যবস্থা করা যায়—পারমাণবিক চুল্লীর সাহায্যে কিংবা অন্য কোনোভাবে, তবে ঐ এলাকায় গভীর স্তরের জল উষ্ণ হয়ে উপরে উঠে আসবে, আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের তলা থেকে নিয়ে

আসবে প্ল্যাঙ্কটনের প্রচুর খাদ্য। মানুষের খাদ্য-সমস্যার প্রতিকারের এও একটা দিক।

নিছক খাদ্যের কথা বাদ দিলেও সমুদ্রের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু এখনও পাবার আছে ; শক্তির উৎস হিসাবে সমুদ্রকে ব্যবহার করা এরই অন্যতম। চার উপায়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হতে পারে। নীচের পর পর চারটি অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আমরা এর আলোচনা করছি। এর ভিতরে দু'টি পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ ইতিমধ্যেই হয়েছে ; এবং অন্য দু'টি এখনও চিন্তা-ভাবনার স্তরে আছে।

সমুদ্রের বিভিন্ন গভীরতায় জলের উষ্ণতার তফাত কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। উষ্ণতার যথেষ্ট ব্যবধানে তাপের দুটো উৎস পেলেই তা' থেকে 'এঞ্জিন' তৈরির কথা ভাবা যায়। যেমন, রেলগাড়ীর 'স্টীম্ এঞ্জিন্'-এ কয়লা পুড়িয়ে 'বয়্লার্' রাখা হয় উচ্চ উষ্ণতায়। এই বয়্লার্ এবং চারপাশের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার ব্যবধানকে কাজে লাগিয়ে এঞ্জিন্ তৈরি সম্ভব হয়। (সাধারণত এঞ্জিনে তাপ-শক্তি যান্ত্রিক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু, উপযুক্ত ব্যবস্থায় তাপ-শক্তির বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরও হ'তে পারে। এরকম অজস্র উৎপাদন-কেন্দ্র আমাদের দেশেও আছে,—যদিও তা' প্রাকৃতিক ইন্ধনের ভরসায় চলে ; সমুদ্রের সাহায্যে নয়।) কিন্তু, এর জন্য কয়লা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক ইন্ধনের ব্যয় নিশ্চয়ই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত নয়, কারণ—সব রকম ইন্ধনেরই এখন পৃথিবীময় অপ্রাচুর্য। যদিও একথা ঠিক যে, সমুদ্রের জল যখন কোনো-না-কোনো তাপমাত্রায় রয়েছে, তখন এখান থেকে তাপ টেনে নিয়ে কোনো যন্ত্র চালাবার কথা আমরা ভাবতে পারি। (এভাবে বাতাস থেকে তাপ টেনে নিয়ে এরোপ্লেন চালাবার কথাও ভাবা যায়।) কিন্তু এ জাতীয় পরিকল্পনার তত্ত্বগত বাধা না-থাকলেও অভিজ্ঞতায় এরা অসম্ভব ব'লেই প্রমাণিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে—তাপের যে কোনো একটা উৎস থাকলেই সে তাপকে কাজে লাগানো যাবে না ; চাই দু'টো বস্তুর ভিতরে উষ্ণতার ব্যবধান। তবেই তাপ-শক্তি প্রবাহিত হবে উচ্চ উষ্ণতার বস্তু থেকে নিম্ন উষ্ণতার বস্তুতে, এবং তাপের এই স্বাভাবিক প্রবাহই তাপীয় যন্ত্র তৈরীর মূল ভিত্তি। উষ্ণতার এই ব্যবধান মানুষকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করতে হয় জ্বালানী খরচ ক'রে—ঐ স্টীম্ এঞ্জিনেই যেমন। কিন্তু, সমুদ্রে এ ধরনের ব্যবধান আপনা থেকেই তৈরী হয়ে

আছে। সাধারণ বুদ্ধিতেই আমরা বুঝি—সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় উষ্ণতার তারতম্য থাকবেই। অনেক অঞ্চলে সমুদ্রের উপরের তলের এবং হাজার ফুট গভীরের উষ্ণতায় কুড়ি ডিগ্রীরও বেশী তফাত হয়ে যায়। এই ব্যবধান কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনের চেষ্টা ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছে —প্রথমে ফ্রান্সের ও পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায়। ফরাসী বিজ্ঞানী দারসোঁভাল্ (D'Arsonval)-এর মাথায় এই ধরনের পরিকল্পনা প্রথম আসে 1881 সালে। 1931 সালে এক ফরাসী এঞ্জিনীয়ার কিউবাতে এর প্রথম সফল বাস্তব রূপ দেন একটি বাইশ কিলোওয়াটের উৎপাদন-কেন্দ্র তৈরি ক'রে। 1950-এ একটি ফরাসী কোম্পানী আইভরি কোস্ট্-এ একটি সাত মেগাওয়াটের কেন্দ্র তৈরি করে। এগুলো সবই স্থলভাগে স্থাপিত। জলের উপরে ভাসমান উৎপাদন-কেন্দ্র প্রথমে তৈরি করে আমেরিকা 1979-তে। কিন্তু, এই পদ্ধতির প্রধান বাধা দু'টো। প্রথমত, সমুদ্রের সব অঞ্চলই এই প্রচেষ্টার পক্ষে উপযুক্ত নয়। যে সব অঞ্চলে গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার পরিবর্তন দ্রুত, সেখানেই এ ধরনের শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ শিল্পাঞ্চল সমুদ্র-তীর থেকে অনেক দূরে। সমুদ্র উপকূল থেকে দু'-একশো মাইলের ভিতরে যদি চাহিদার কেন্দ্রটি না-থাকে, তবে আলোচিত পদ্ধতি বিশেষ লাভজনক হয় না। এইসব সত্ত্বেও এই পদ্ধতির আরও উন্নতির জোরদার চেষ্টা চলছে ফ্রান্সে এবং আমেরিকায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে জোয়ারের ঢেউকে কাজে লাগানো হয়। বাতাসের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে অতীত যুগে যেভাবে 'উইণ্ড্‌মিল্' তৈরী হ'ত, সেই একই নীতিতে জোয়ারের জলের ধাক্কা কাজে লাগিয়ে 'টাইড্যাল্ মিল্' তৈরীর চিন্তা মোটেই আধুনিক নয়। প্রাচীন মিশরে এই ধরনের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরী এই ধরনের একটি যন্ত্র আটশো বছর ধ'রে কাজ করেছে। তবে, এইসব চেষ্টার মূল উদ্দেশ্য ছিল শস্য গুঁড়ো করা। আধুনিক যুগে এর নতুন লক্ষ্য হ'ল বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন। একদিনে দু'টি জোয়ার এবং দু'টি ভাঁটা আসে। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী সমুদ্রেই এ ঘটনা ঘটে, যদিও সর্বত্রই একে কাজে লাগানো সহজ হয় না। সমুদ্রের জোয়ারের উঁচু ঢেউ যেখানে নদীর মোহনা-পথে ভিতরে ঢোকে, সেখানেই একে ব্যবহার করা সহজ। বিশেষ বিশেষ উপসাগরেও একই ধরনের বিবেচনা খাটে। কানাডার

'বে অব্ ফাণ্ডি' দুই তীর নদীর তীরের মতো সমান্তরালভাবে ঢুকেছে দেশের ভিতরে, এবং তারপরে আবার দুটো নদীর মতো দু'ভাগ হয়ে গেছে 'চিগ্‌নেটো বে' এবং 'মিনাস্ বেসিন্'-এ (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। জোয়ারের ঢেউ অনেক সময়ে যথাক্রমে 46 এবং 60 ফুট উঁচু হয়ে এই দু'টি খাড়িতে ঢোকে। এই ধরনের জায়গাই 'জোয়ার-শক্তিকেন্দ্র' হবার পক্ষে উপযুক্ত। কানাডার সরকারও প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে বিবেচনা করছেন এখানে ঐ রকম শক্তি-কেন্দ্র বসানোর বিষয়টি। এ রকম আরও কয়েকটি অঞ্চলের নাম করা যায়; কিন্তু, সম্ভাব্য অঞ্চলের তালিকা তৈরি না-ক'রে আমরা দু'টি বাস্তব সাফল্যের দৃষ্টান্ত দিতে চাই। 1966 সালে ফ্রান্সের রাঁকে-নদীর খাড়িতে যে শক্তি-কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তা'র বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বছরে 600 মিলিয়ন কিলোওয়াট্-ঘণ্টা। রাশিয়ার শ্বেত সমুদ্রেও একটি কেন্দ্র কাজ করছে 1969 সাল থেকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, আর সব দেশের তুলনায় রাশিয়ারই ভৌগোলিক সুবিধে সবচেয়ে বেশী এই ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণের। এই ধরনের সমস্ত পরিকল্পনার নীতিই সাধারণ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতির মতো। উপযুক্ত বাঁধ দিয়ে জোয়ারের জলকে বিশেষ সুবিধাজনকভাবে চালিত করতে হবে যা'তে সে টার্‌বাইন্ ঘোরাতে পারে। এই টারবাইন্‌কে কাজ করতে হবে জলের বিপরীতমুখী প্রবাহের সময়েও; কারণ—ভাঁটার সময়ে জলের গতি বিপরীতমুখী হবে। এই পদ্ধতির সুবিধে এবং অসুবিধের দিকগুলোও সংক্ষেপে ব'লে রাখা যায়। সাধারণ জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রর তুলনায় জোয়ারচালিত কেন্দ্র নিঃসন্দেহে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ, নদীতে জলের স্বাভাবিক পরিমাণের কোনোও স্থিরতা নেই। কিন্তু, জোয়ার-ভাঁটার মাত্রা এবং তা'র ক্রিয়াকাল নির্ভুলভাবে আগে থেকেই আমরা জানি। অসুবিধের দিকও অল্প গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথমত, আগেই যা' আমরা বুঝতে পেরেছি, সমুদ্র উপকূলের সর্বত্র এই জাতীয় শক্তি-কেন্দ্র গড়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়। যে জায়গা উপযুক্ত, তা'র ধারে-কাছে হয়তো কোনো বড় শিল্পাঞ্চল নেই; সুতরাং সেখানে বিদ্যুতের তেমন চাহিদাও নেই। দ্বিতীয়ত, দিনে দু'টো জোয়ার এবং দু'টো ভাঁটা আসে ঠিকই; কিন্তু, এই 'দিন' আমাদের অতি পরিচিত 'সৌর দিন' নয়, এটা 'চান্দ্র দিন', কারণ, জোয়ার-ভাঁটা প্রধানত চন্দ্রের আবর্তন নিয়ন্ত্রিত। চান্দ্র দিন সৌর দিনের তুলনায় দীর্ঘতর। অতএব, চান্দ্র দিন অনুসারে যখন জোয়ার আসে, আমাদের ঘড়ির হিসেবে প্রত্যেক দিন একই

সময়ে আসে না ; রোজই তা'র খানিকটা দেরী হয়। কিন্তু, কল-কারখানায় কাজের সময় তো ঘড়ি অনুসারেই হয়। সুতরাং, কেবল জোয়ার এবং ভাঁটার টানের সময়ে বিদ্যুৎ পেয়ে আমাদের তেমন সুবিধে নেই। সব সময়ে সমান উৎপাদনের ব্যবস্থা যদি করা যায় তবেই লাভ আছে।

তৃতীয় পদ্ধতি লবণ সংযুক্তির পদ্ধতি। লবণাক্ত জলে যখন স্বাভাবিক জল বা অল্প লবণাক্ত জল মেশানো হয়, তখন কিছু পরিমাণ শক্তি মুক্তি পায় 'অভিস্রবণ' বা 'osmosis'-এর নিয়ম অনুসারে। ঐ পরিমাণ সহজেই গণনা করা যায়, এবং এই শক্তিকেও বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হ'লে লবণাক্ত জলে সাধারণ জল মেশানোর কাজটি আমাদের করতে হবে না ; প্রকৃতিতে এই কাজ বিরামহীনভাবে হয়ে চলেছে। পৃথিবীর সব নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ার ফলে যে হারে শক্তির মুক্তি হয়, তা' সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারের হারের তিন গুণ। কিন্তু, এটা নিতান্তই তাত্ত্বিক হিসেব। এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্য শক্তি-কেন্দ্রর চেহারা ঠিক কেমন হওয়া দরকার, তা' এখনও ঠিক বোঝা যায় নি। এ কথা হয়তো ঠিক যে—সব নদীর মোহনা এই পদ্ধতি প্রয়োগের উপযুক্ত ব'লে গণ্য হবে না ; কিন্তু, বিশিষ্ট কয়েকটি নদীকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেও প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞের হিসাব মতে—মিসিসিপি-নদীর প্রবাহের শতকরা দশ ভাগ যদি শতকরা পঁচিশ ভাগ দক্ষতায় কাজে লাগানো যায়, তা'হলেও এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হ'তে পারে। এ ক্ষেত্রে সমুদ্রের জলের স্বাভাবিক লবণাক্ততা বিবেচনা করা হয়েছে। ডেড্ সী বা গ্রেট্ সল্ট্ লেক্-এর মতো অতি লবণাক্ত জলে যখন স্বাভাবিক জল এসে পড়ে, তখন আরও লোভনীয় সম্ভাবনা দেখা দেয়।

নিছক সমুদ্রের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটা চতুর্থ পদ্ধতিও আমরা ভাবতে পারি। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশে দু'টি বিশেষ স্রোতের আলোচনায় আমরা আন্দাজ পেয়েছি—এক-একটি স্রোত কি বিপুল পরিমাণ জল বহন করে, এবং, ফলে, কি বিরাট পরিমাণ শক্তি এর সঙ্গে জড়িত থাকা সম্ভব। অবশ্য, অসুবিধা এই যে, সামুদ্রিক স্রোতের গতিবেগ সাধারণ অর্থে খুব বেশী নয়, এবং তা'র ফলে, অল্প জায়গার উপরে সে তেমন বেশী ধাক্কা দিতে পারে না। এই কারণে টারবাইন্ জাতীয় কোনো যন্ত্র ঘোরানো

এর পক্ষে শক্ত। তবু এই পদ্ধতি কাজে লাগাবার কথা ভাবা হয়েছে। সম্ভাব্য একটি পরিকল্পনায় অনেকগুলো সমান্তরাল এবং লম্বা চোঙ (cylinder) জলের ভিতরে স্রোতের সমান্তরালভাবে রাখার কথা বলা হয়েছে। এই চোঙ-গুলোর ভিতরে উপযুক্তভাবে অনেকগুলো 'প্রোপেলার' বসানো থাকবে—যা'রা স্রোতের ধাক্কায় ঘুরবে।

উপরের চারটি পদ্ধতির নানা সুবিধা আর অসুবিধার দিক আছে—যা'র দু'-একটি আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এক হিসাবে এই সব ক'টি পদ্ধতিই প্রচলিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঃ এই পদ্ধতিগুলোতে পরিবেশ-দূষ্টির সম্ভাবনা তেমন নেই, যদিও অন্য ধরনের অসুবিধা দেখা দেবার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারে। যেমন, সমুদ্রের অনেকগুলো স্রোতকে যদি যথেষ্ট বাধা দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের প্রাণিজগতে এর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। তা'ছাড়া, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যে কোনো ধাতুতেই তৈরী হোক-না কেন, সমুদ্রের লবণাক্ত জলের নিরন্তর স্পর্শ তা'দের দীর্ঘস্থায়ী হ'তে দেবে না। তবু, সব রকম অসুবিধা মেনে নেবার পরেও সমুদ্রই হবে শক্তি উৎপাদনে আমাদের শেষ ভরসা। পৃথিবীর ইন্ধনের সঞ্চয় মানুষের প্রচণ্ড চাহিদায় দ্রুত নিঃশেষের পথে। কিন্তু, সমুদ্রকে এভাবে 'নিঃশেষ' করা শক্ত। সেখান থেকে আমরা যে শক্তি বা'র ক'রে নেব, তা'র পূরণ হয়ে যাবে প্রাকৃতিকভাবেই। যেমন, বিভিন্ন গভীরতায় জলের উষ্ণতার ব্যবধান কাজে লাগিয়ে যখন আমরা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করছি, তখন শক্তির যোগান আসলে দিচ্ছে সূর্য। উষ্ণতার ঐ পার্থক্য সে প্রতিদিনই আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে দেবে। এইভাবে, যখনই আমরা সমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করছি, শক্তির আসল যোগান দিচ্ছে সূর্য অথবা চন্দ্র অথবা পৃথিবীর ঘূর্ণন এবং বাতাসের স্রোত। এদের আমরা কোনোভাবে ক্ষয় না-ক'রেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছি।

সমুদ্র ইদানীং পেট্রোলিয়াম আর প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে, কয়েক দশক আগেও যা' কল্পনার অতীত ছিল। জলের মধ্যে তেলের প্রথম কূপ খোঁড়া হয় 1945 সালে—লুইসিয়ানার কাছে। এখন বছরে সারা পৃথিবীতে মোট এক হাজারের বেশী কূপ জন্ম নিচ্ছে। জলের ভিতর থেকে এইভাবে তেল তোলার প্রচণ্ড খরচ সত্ত্বেও উৎসাহের কোনো ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না, পেট্রোলিয়াম এমনই অপরিহার্য আধুনিক সভ্যতায়। 1972 সালে

সমুদ্রের অগভীর তলা থেকে তেল তোলার জন্য যে সব নতুন কূপ বসানো হয়, তা' বাবদ ঐ বছরে সারা পৃথিবীতে মোট খরচ হয় 4,000,000,000 ডলার, এবং সম্প্রতি এই অঙ্ক বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। সমুদ্রের সমস্ত 'মহাদেশিক তাক' [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য] জুড়ে অন্তত প্রাথমিক অনুসন্ধান চালানোর জোর চেষ্টা চলছে। 1945 সালের উল্লিখিত প্রথম সাফল্যের পরে সত্তরের দশকের শেষ অবধি মোট পঁচাত্তরটি দেশের চেষ্টায় মোট আশি লক্ষ বর্গ মাইল এলাকায় অনুসন্ধান চালানো হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের অগভীর 'তাক'-এ। গভীরতর অনুসন্ধান—যা'তে খোঁড়াখুঁড়ি জড়িত—অবশ্যই অনেক ধীরগতিতে চলে। মোট 'মহাদেশিক তাক'-এর শতকরা মাত্র দু'ভাগ এখন পর্যন্ত এই গভীর অনুসন্ধানের এলাকায় এসেছে। 'ভূকম্প তরঙ্গ'-র সাহায্যে সমস্ত মহাদেশিক তাক-এ প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজেও এখনও এক শতাব্দীর বেশী সময় লাগবার কথা।—এ থেকে বোঝা যাবে, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব্য বিশাল সঞ্চয়ের সামান্যই এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। 1974 সালের প্রথম দিকে পৃথিবীর মোট তেলের সঞ্চয়ের যে হিসেব করা হয়, তা'র শতকরা আঠেরো ভাগ ছিল সমুদ্রের জলের নীচে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে এটা ছিল শতকরা প্রায় দশ ভাগ। সাগরতলার সম্পদের এই অনুপাতগুলো ক্রমশ বাড়ছে। গত দশকে কী পরিমাণ তেল এবং গ্যাস্ অগভীর সমুদ্রের তলা থেকে তোলা হয়েছে, তারও একটা আন্দাজ আমরা পেতে পারি। 1973 সালে এই পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 360 মিলিয়ন ব্যারেল্ এবং 53,000,000 মিলিয়ন ঘনফুট। অগভীর তেলের সম্পদে এখন সবচেয়ে সমৃদ্ধ দু'টো এলাকা হ'ল পারস্য উপসাগর এবং মেক্সিকো উপসাগর। কেবল অগভীর সমুদ্রেই তেলের সন্ধান মেলে, এই পুরোনো ধারণাও ইদানীং ভেঙে গিয়েছে; কারণ, মেক্সিকো উপসাগরের 10,000—13,000 ফুট গভীরতায় খোঁজ মিলেছে পেট্রোলিয়ামের।

সমুদ্রের নীচে খনিজের বিশাল ভাণ্ডারের সঙ্গে অবশ্য অন্য কিছুরই তুলনা চলে না। বহু কোটি বছর ধ'রে নদীর স্রোতে কত কীই ধুয়ে নেমেছে সমুদ্রে। এ ছাড়া, জলের নীচের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও সমুদ্রকে প্রচুর খনিজ উপহার দিয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। শুনতে অদ্ভুত মনে হ'লেও, সমুদ্রে খনিজ চালান দেবার ইতিহাসে বাতাসের ভূমিকাও সামান্য নয়।—উপকূলবর্তী সাগর-তলার সম্পদ তুলে নেবার কাজ অবশ্য শুরু হয়ে গেছে। মেক্সিকো উপসাগরের

অল্প গভীরে সালফার্ বা গন্ধকের বিরাট সঞ্চয়। এটা তোলার জন্য দু'টি সমকেন্দ্রিক, লম্বা নলের এক প্রান্ত ঐ গন্ধকের স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়। অন্য প্রান্ত জলের উপরে থাকে। এবারে স্থূলতর নলের বাইরের বলয়-মুখ দিয়ে অতি তপ্ত জল তীব্র চাপে নীচে চালিয়ে দেওয়া হয়। (বেশী চাপে জলের উষ্ণতা 100°C-এর চেয়ে অনেক বেশী হওয়া সম্ভব।) এর ফলে নীচের গন্ধক গ'লে যায়, আর মাঝখানের নল দিয়ে উপরে উঠে আসে চারপাশের জলের চাপে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ফস্ফোরাইটের বিশাল ভাণ্ডার—যা' থেকে প্রচুর ফস্ফরাস্ বা'র করা সম্ভব। ক্যালিফোর্নিয়ার কাছে অগভীর অঞ্চলে আশ্চর্য সমান বিশুদ্ধতায় এবং প্রচুর পরিমাণে ফস্ফোরাইট্ প'ড়ে আছে। আরেক ধরনের ফস্ফেটের প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলে মাত্র দেড়শো ফুট গভীরে।

কিন্তু, সম্পদের আসল সঞ্চয় আছে গভীর সমুদ্রের নীচে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে থিতিয়ে আছে কাদার মতো চেহারায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ (মূলত ক্যালসিয়াম কার্বনেট ঘটিত) পদার্থ—পরিভাষায় যা'কে বলে 'ooze', যার উপযুক্ত কোনো বাংলা প্রতিশব্দ এখনও নেই।* এদের গঠনের মূল উপাদান দু'টি: অগ্ন্যুৎপাতের ধূলিকণা এবং মৃত প্রাণী—যা'রা সমুদ্রের তলায় শেষ আশ্রয় পেয়েছে।** আন্দাজ করা হয়, ক্যালসিয়ামে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এই কাদা—অনেক ক্ষেত্রে প্রায় বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেট—সমুদ্রের তলায় প'ড়ে আছে 10^{16} টন। হাল্কা কংক্রীট্ তৈরীর কাজে এরা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে; কারণ, এই কাজে লাগবার মতো কিছু বৈশিষ্ট্য এদের আছে; সাধারণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট থেকে এদের ধর্ম কিছু আলাদা। সাধারণভাবে এই পাঁক বা 'ooze' তাপরোধক এবং শব্দরোধক হিসাবে কাজে লাগতে পারে; ফিল্টার হিসাবে ব্যবহারের উপযুক্ত, এবং কৃষি-জমির উন্নতি ঘটাতে প্রয়োগ করা যায়।

এছাড়া আর এক ধরনের কাদা-জাতীয় বস্তু আছে—যা'কে দেখতে লালচে ব'লে তা'র নাম 'লাল কাদা' বা red clay। সদ্য আলোচিত 'ooze' এবং এই

* ooze-এর 'চলন্তিকা'সিদ্ধ বাংলা 'সিন্ধুকর্দ'।

** 'ooze'-এর আবার উপবিভাগ আছে: calcarious ooze এবং silicious ooze,—গঠনের উপাদানের প্রাধান্য অনুসারে। প্রত্যেক উপবিভাগের আবার তস্য উপবিভাগ আছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে: pteropod ooze, globigerina ooze এবং coccolith ooze। দ্বিতীয়টির জন্য radiclarian ooze এবং diatom ooze। কিন্তু, এত বিস্তৃত আলোচনা আমাদের পক্ষে জরুরী নয়।

'লাল কাদা'র প্রাথমিক তফাত এই যে, এই শেষোক্ত বস্তুটি কেবল অজৈব পদার্থেই তৈরী। এই কাদার মূল উপাদান অ্যালুমিনিয়ম সিলিকেট। এছাড়া অবশ্য অগ্ন্যুৎপাতজনিত নানা পদার্থ, হাঙ্গরের দাঁত ইত্যাদিও আছে। আয়রন অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য এদের লাল দেখায়। ভবিষ্যতে হয়তো এ থেকে ধাতু-নিষ্কাশন সম্ভব হবে ; এখনও এই কাদাকে কাজে লাগাবার তেমন কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ধাতুর কথা বলতে হ'লে লোহিত সাগরের নীচে কয়েকটি ধাতুসমৃদ্ধ কুণ্ডের কথাও বলতে হয়। এখানে বেশ উঁচু মানের তামা, দস্তা, সোনা, রুপো ইত্যাদি মিলিয়ে দু'শো কোটি ডলারের সম্পত্তি জলের সাড়ে-ছ' হাজার ফুট নীচে প'ড়ে আছে। কতকটা কাদা-কাদা অবস্থায় থাকার দরুন এদের পাম্প্ ক'রেই উপরে তোলা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয়।

তবে, আর্থিক বিবেচনায় সবচেয়ে দামী জিনিস ম্যাঙ্গানিজের গোলা। এরা বিশুদ্ধ ম্যাঙ্গানিজ নয়। অনেক ধাতু এতে আছে ; এবং বিশেষ কিছু রাসায়নিক কারণে এরা গোলা পাকিয়ে থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের তলাতেই এদের খুব বেশী পাওয়া যায়। কেবল এখানেই $1{\cdot}5 \times 10^{12}$ টন পরিমাণ এই বস্তু আছে ব'লে জানা গিয়েছে। শুধু তা'ই নয় ; বছরে এক কোটি টন ক'রে তৈরী হয়েই চলেছে। যদিও এদের গঠনের আঞ্চলিক তারতম্য আছে, তবু মোটামুটিভাবে এতে ম্যাঙ্গানিজ এবং লোহাই প্রধান ; তামা 2%, কোবাল্ট্ 0·2—2·5%, নিকেল 2% ইত্যাদি। আরও সঠিকভাবে বোঝাবার জন্য বলা যেতে পারে,—শুধু প্রশান্ত মহাসাগরের তলাতে ম্যাঙ্গানিজ-গোলায় যে সব ধাতু আছে, তা' মানুষের বর্তমান চাহিদার হারের তুলনায় প্রায় অফুরন্ত। পৃথিবীতে এখন রুপোর যা' বার্ষিক চাহিদা, তা'তে ঐ ম্যাঙ্গানিজ-গোলায় সঞ্চিত রুপোয় একশো বছর চলা উচিত ; সীসের সঞ্চয়ে এক হাজার বছর, লোহায় দু'হাজার বছর এবং তামার সঞ্চয়ে ছ'হাজার বছর চলা উচিত। এ ছাড়া, বর্তমান চাহিদার হিসাবে ওখানকার সঞ্চিত অ্যালুমিনিয়ামে চলা উচিত কুড়ি হাজার বছর, নিকেলের সঞ্চয়ে দেড় লক্ষ বছর এবং ম্যাঙ্গানিজে চার লক্ষ বছর।* জলের

* হিসেবটা 1964 সালের। দ্রষ্টব্য : 'The Mineral Resources of the Sea' by J. L. Mero. ইদানীং ঐ সব ধাতুর ব্যবহার নিশ্চয়ই আরও বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং, এখনকার হিসেব কিছুটা অন্যরকম হবে। এই বিষয়ে আরেকটি প্রামাণিক গ্রন্থ : Deep Seabed Minerals : Resources, Diplomacy and Strategic Interest

—U. S. Govt., 1978

বদলে ডাঙায় এই সঞ্চয় খুঁজে পাওয়া গেলে বাজারের চেহারাই বদলে যেত। অবশ্য, জলের তলা থেকে এদের তোলার পরিকল্পনা অনেকদিন থেকেই হচ্ছে। কিন্তু, কম খরচের কোনো পদ্ধতি খুঁজে না পেলে ব্যাপকভাবে এগুলো তোলার কাজ শুরু হ'তে পারে না।

সমুদ্র আমাদের প্রয়োজনীয় আরও কত কী দিতে পারে, তা'র নিরস কমার্শিয়াল তালিকা এখানে দাখিল করবার দরকার নেই। কিন্তু, সমুদ্র সত্যিই স্বর্ণপ্রসূ, যতটা আমরা এখন জানি, তা'র চাইতেও। উর্বর মাটির ফসলকে আমরা 'সোনা' বলি, সুতরাং সমুদ্রের ফসলকেও তা' না-বলার কারণ নেই। তা'হলেও অবশ্য এ 'সোনা' নেহাৎই রূপক। কিন্তু সমুদ্র থেকে একবার যে সত্যিকার সোনা খুঁজে বা'র করার রীতিমত চেষ্টাও হয়েছিল, সে কথা বলেই এবারের আসর শেষ করি।

পাঠক নিশ্চয়ই জানেন—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর আর্থিক অবস্থা অনেকটা খারাপ হয়ে যায়। রসায়নে নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া জার্মান অধ্যাপক ফ্রিট্জ্ হেবার [Fritz Haber : 1868-1934] অনেক ভেবে এর একটা প্রতিকার বা'র করেন। অবশ্য আইডিয়াটা তিনি পেয়েছিলেন আর একজন নোবেলিত অধ্যাপক আরেনিয়াস্ [S. A. Arrhenius : 1859-1927]-এর কাছ থেকে। এই শেষোক্ত বিজ্ঞানী হিসেব এবং পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছিলেন—প্রতি ছয় টন সমুদ্রের জলে এক আউন্স্ সোনা আছে। আপাতভাবে হিসেবটা তেমন উত্তেজক নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু হেবার্ জানতেন—সমুদ্রে জলের কিছু কমতি নেই, এবং অনেক জল মানেই অনেক সোনা। তাঁর প্ল্যান্ অনুসারে কাজ চালালে জার্মানীর সব বৈদেশিক ঋণ শোধ তো হবেই,—বিচক্ষণ হেবার্ জানতেন, এমনকি প্রতিটি জার্মান্ নাগরিক এক-একজন কোটিপতি হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু, এ ব্যাপারে গবেষণা চালানোর জন্য প্রচুর টাকা এবং একটি জাহাজ চাই।—হেবারের চেষ্টায় 'Meteor' নামে একটি যুদ্ধ-জাহাজ যোগাড় হ'ল; টাকার ব্যবস্থা করাও সম্ভব হ'ল। বিশিষ্ট সমুদ্র-বিজ্ঞান বিশারদ ডঃ আলফ্রেড্ মার্জ হলেন ঐ জাহাজের গবেষণা-বিভাগের নেতা। সঙ্গে রইলেন অধ্যাপক জর্গ ওয়াস্ট্—সম্পর্কে মার্জ-সাহেবের শালা, এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী। 1925-এর এপ্রিল নাগাদ 'Meteor' যাত্রা শুরু করল। স্বয়ং হেবার্ অবশ্য গেলেন না।

গবেষণার কাজ খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছিল ; কিন্তু কিছুদিন পরেই ডঃ মার্জ্ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হ'তে থাকল। আসলে অসুস্থ তিনি হয়েছিলেন অনেক আগেই ; কিন্তু, একেবারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যাবার আগে অবধি কাউকে কিছু টের পেতে দেননি।—জাহাজটিকে তা'র দ্রুততম গতিতে বুয়েনস্ এয়ার্স-এ নিয়ে যাওয়া হ'ল ; ডঃ মার্জ্‌কে সেখানে নেওয়া হ'ল হাসপাতালে। কিন্তু, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

এবারে অধ্যাপক ওয়াস্ট্‌কে নেতা নির্বাচিত ক'রে আবার অভিযান চালানো হ'ল। মোট 777 দিনের এই অভিযানে জাহাজটি চল্লিশবার সাইক্লোনের মুখে পড়ে, এবং 1927-এর জুলাইতে জার্মানী ফিরে আসে। সঙ্গে নিয়ে আসে সমুদ্রের নানা অঞ্চলের জলের নমুনা। সেইসব জলের বোতল নিয়ে হেবার্ ছুটলেন তাঁর গবেষণাগারে।—হ্যাঁ। সোনা তা'তে আছে বটে, এবং সেই সোনা আলাদা করাও সম্ভব হ'ল। কিন্তু, সোনা এত কম কেন ?

কারণ খুঁজতে গিয়ে হেবার্ দেখলেন, তাঁর গুরু আরেনিয়াস্ সাহেব গোড়াতেই গণ্ডগোল ক'রে বসেছেন। আরেনিয়াস্ সমুদ্রের জল সংগ্রহ করেছিলেন ধাতুর বোতলে, এবং সেই ধাতুতে সমুদ্রের জলের চাইতে অনেক বেশী সোনা ছিল। ফলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই বোতলের জলে সোনার ভাগ অনেক বেড়ে গেছে। আসলে সমুদ্রের জলে সোনা অনেক কম। হেবার অবশ্য তখনও হাল ছাড়েননি, এবং পুরোনো যুক্তিতেই আস্থা রেখেছেন ঃ যতই কম সোনা থাক, সমুদ্রে জলের তো কিছু কমতি নেই! সুতরাং অঢেল সোনা পাওয়া যাবেই!—হেবারের যুক্তিটা অবশ্য ঠিকই ছিল ; কিন্তু, দেখা গেল—ঐ সোনা বা'র করতে যা' খরচ পড়ে, সেই খরচে বাজার থেকে ওর দ্বিগুণ সোনা কেনা যায়।……এবার হেবার্ থামলেন। জার্মানদের কোটিপতি হবার আশায় ইস্তফা দিতে হ'ল। অধ্যাপক্ ওয়াস্ট্ পরে সহাস্যে মন্তব্য করেন ঃ সমুদ্রে সোনা খোঁজা, আর খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা—একই ব্যাপার! ['Looking for gold in the sea is like looking for a needle in a haystack.']

● পরিশিষ্ট—1 ●

সমুদ্র-হত্যা

মানুষ কী কী ভাবে সমুদ্রের ক্ষতি করে, তা'র একটা খতিয়ান এখানে নেওয়া যেতে পারে। যদিও এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। সমুদ্রদূষণের প্রসঙ্গ সামগ্রিকভাবে পরিবেশদূষণের সঙ্গে জড়িত, এবং আলাদাভাবে সমুদ্রদূষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা করা দুঃসাধ্য। তবু, জনসংখ্যার প্রচণ্ড চাপে এবং যন্ত্রসভ্যতার অবিশ্বাস্য উন্নতিতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানুষ সমুদ্র-হত্যার যে আয়োজন করেছে বিরাট আকারে—তা'র সঙ্গে একটা প্রাথমিক পরিচয় আমরা এখানে ক'রে নিতে পারি।

এক হিসাবে—মানুষের পরিত্যক্ত সমস্ত জঞ্জালেরই শেষ আশ্রয় সমুদ্র। আমাদের বাড়ীর নর্দমা দিয়ে যে নোংরা জলের ক্ষীণ ধারা বইছে, তারও গতি সমুদ্রের দিকেই, সমুদ্র সেখান থেকে যত দূরেই হোক-না কেন। বস্তুত, সমুদ্র-দূষণের একটা বড় কারণই নর্দমার আবর্জনা। সাধারণত নদীবাহিত হয়ে এই আবর্জনা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সুতরাং, নদীর জঞ্জালের পুণ্যকাহিনী শুনলেই সমুদ্রের ভাগ্য অনেকটা বোঝা যায়। পৃথিবীর অনেক বিশিষ্ট নদী—বিশেষত, বড় শহরচুম্বী নদীগুলো—অবিশ্বাস্য পরিমাণ আবর্জনা বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-নদী অনেকগুলো জনপদ ছুঁয়ে যায়, এবং ক্রমশ নোংরা হ'তে হ'তে যায়। এই নদীচুম্বিত শহর সেণ্ট্ লুইস্ প্রতিদিন একাই 200,000 গ্যালন প্রস্রাব এবং 400 টন কঠিন ক্লেদ এই নদীকে উপহার দেয়; কল-কারখানার আরও বিপুল আবর্জনার কথা ছেড়েই দিলাম। ব্রিটেনের সচেতন নাগরিক এবং সরকার এখন টেম্স্-নদীর অবস্থা অনেকটা ফিরিয়েছেন। কিন্তু, শতাধিক বছর আগে একজন লেখক এই নদী সম্পর্কে লিখেছিলেন—'...এই জঞ্জালের অনেকটাই দীর্ঘকাল প্রাক্পচনের অবস্থায় থাকে, এবং জোয়ার আর ভাঁটায় তা' একবার শহরের মধ্যে ঢোকে, আবার বেরোয়। এই সময়ে টেম্স্-এর দুর্গন্ধের জন্য পার্লামেণ্টের দুই হাউস্-এরই অধিবেশন মুলতবী থাকা কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়।'

নর্দমাবাহিত আবর্জনার দু'টি অংশ আছে: জৈব পদার্থের এবং অজৈব পদার্থের অংশ। অজৈব পদার্থের ভিতরে সবচেয়ে ক্ষতিকর পারদঘটিত আবর্জনা। জাপানের মিনিমাতা-উপসাগরের একটি দুর্ঘটনা পঞ্চাশের দশকে এই বিষয়ে পৃথিবীকে প্রথম সচেতন ক'রে তোলে। একটি প্লাস্টিক্-কারখানার বর্জিত পারদঘটিত বস্তুতে ঐ উপসাগরের মাছ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে যায়।

ঐ উপসাগরের মাছ নিয়মিত খেতেন এমন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অবশ্য চরম ঘটনা ; যাঁদের মৃত্যু হয়নি—তাঁদের অনেকেরই ভাগ্যে জুটেছে অন্ধত্ব, বধিরতা, পাকস্থলি এবং মস্তিষ্কের নানা রোগ। এমন কি—কিছু বেড়াল ঐ উপসাগরের মাছ খেয়ে উন্মাদ আচরণ করতে থাকে, এবং অনেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, সীসাঘটিত আবর্জনাও অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু, বিশেষভাবে বলা উচিত কীটনাশকের—বিশেষত, 'ডি. ডি. টি.'র—কথা।

ডাইক্লোরোডাইফিনাইল্ট্রাইক্লোরোইথেন্—সংক্ষেপে ডি. ডি. টি.—বিজ্ঞানের আশীর্বাদ হিসাবেই প্রথম দেখা দেয়, এবং এর আবিষ্কারক পি. এইচ্. মুলার্ রসায়নে নোবেল-পুরস্কার পান (1948)। কিন্তু, এর ক্ষতিকর ক্রিয়ার ধীরগতি মানুষের চোখে পড়তে বেশ দেরী হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বাতাস, মাটি এবং জলে কয়েক মিলিয়ন টন ডি. ডি. টি., এবং তা'র দোসর—ডি. ডি. ডি., ছড়িয়ে গিয়েছে এবং এদের ক্রিয়াকাল অসম্ভব দীর্ঘ ; আপনা থেকে সহজে এরা নষ্ট হবার নয়। যদিও এই কীটনাশক ব্যবহার করা হয় অত্যন্ত অল্প ঘনত্বে, দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের 0·02 অংশের বেশী ঘনত্বে নয় ; কিন্তু জীবদেহে এদের সঞ্চয় অদ্ভুতভাবে বেড়ে চলে। প্রথমে উদ্ভিদে এরা অল্প ঘনত্বে জমা হয় ; সেই উদ্ভিদভোজী ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে এদের সঞ্চয়ের ঘনত্ব বেড়ে যায় ; এই প্রাণীভুক প্রাণীদের দেহে ওই বিষ আরও বেশী ঘনত্বে জমা হয় ;...ইত্যাদি। এইভাবে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি হ্রদের মাছের দেহে এই বিষ ব্যবহৃত ঘনত্বের বারো হাজার গুণ এবং এক জাতীয় পশ্চিমী হাঁসের শরীরে আশি হাজার গুণ ঘনত্বে আবিষ্কার করা গিয়েছে। সাধারণত প্রাণীদেহের চর্বিতে এরা জমে। সুমেরু অঞ্চলের এস্কিমো এবং কুমেরু অঞ্চলের পেঙ্গুইনের দেহে এই কীটনাশকের অস্তিত্ব লক্ষ করা গিয়েছে—যে সব অঞ্চলে এর ব্যবহারই হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের 'স্ক্রিপ্স্ ইন্স্টিটিউসন্ অব্ ওসেনোগ্রাফি' আজ থেকে পনেরো বছর আগেই এক রিপোর্টে বলেছিল—পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের মাছের শরীরেই এখন ডি. ডি. টি.-জাতীয় কীটনাশকের বিষ ঢুকে গেছে। এই কীটনাশক দু'ভাবে সমুদ্রের ক্ষতি করে। এরা অনেক মাছ এবং স্তন্যপায়ী জীবের প্রজনন-শক্তি কমায়। যা'র ফলে বিশেষ বিশেষ প্রাণীর অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে প্রাকৃতিক সাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, সামুদ্রিক উদ্ভিদের যে সালোক-

সংশ্লেষ-ক্রিয়ায় পৃথিবীর অধিকাংশ অক্সিজেন তৈরী হয়, ঐ সব কীটনাশকের প্রভাবে সেই ক্রিয়া ক্ষীণ হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক'মে গেলে সমস্ত জলচর প্রাণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কৃষ্ণসাগর এবং বাল্টিক সমুদ্র যে আজ জলচর-প্রাণীহীন—এর পিছনে কীটনাশকের অবদান আছে। বহু দেশে আজ এই ধরনের কীটনাশকের ব্যবহার নিষিদ্ধ; কিন্তু অনুন্নত বহু দেশে এর ব্যবহার এখনও বন্ধ হয়নি। তা'ছাড়া, বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে ইতিমধ্যেই যে বিষ সমুদ্রে নেমে পড়েছে—তা'র হাত থেকে এখন দ্রুত রেহাই পাবার কোনো উপায় মানুষের জানা নেই।

অজৈব আবর্জনার পরেই বলা উচিত জৈব আবর্জনার কথা। এই জাতীয় আবর্জনা প্রধানত আসে সাবানের কারখানা, কাপড়ের কল, তেলের কল, ট্যানারি, ডেয়ারি, বিভিন্ন পরিষ্কারক বস্তু তৈরীর কারখানা, ইত্যাদির নিক্ষিপ্ত বস্তু থেকে। সাধারণত এই আবর্জনা প্রথমে আসে কোনো নদী বা হ্রদে। সেখানে ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় জৈব পদার্থের জটিল আণবিক গঠন ভেঙে সরল আণবিক গঠনে (কার্বন ডাই-অক্সাইড্, অ্যামোনিয়া, জল, বিভিন্ন লবণ, ইত্যাদিতে) আসে। এই ক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন যথেষ্ট খরচ হ'তে পারে। কিন্তু, এর চেয়েও মারাত্মক আর একটি ক্রিয়া ঘটা সম্ভব, যা'কে বলা হয় 'ইউট্রোফিকেশন'। পরের অনুচ্ছেদে এটা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'Algae' একটি সাধারণ নাম—যে নামে বহু রকমের জলজ শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদকে বোঝায়। এদের দৈর্ঘ্য আণুবীক্ষণিক থেকে শুরু ক'রে কয়েক মিটার অবধি হ'তে পারে। এরা শুধু সমুদ্রে নয়, সমস্ত ছোট-বড় জলাশয়ে থাকে। এরা প্রত্যক্ষভাবেও মানুষের নানা কাজে লাগে; কারণ—এইসব উদ্ভিদে আয়োডিন, পটাশ, আগার-আগার, ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস আছে এবং সার ও নানা ওষুধপত্র তৈরীতেও এদের ব্যবহার আছে; কিন্তু, এইসব উদ্ভিদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি অন্য। এই কাজ হ'ল সালোকসংশ্লেষ-ক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করা—যা' আমরা আগেই বলেছি। স্থলভাগের গাছপালা যে পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি করে, তা'র চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে তৈরি করে জলজ উদ্ভিদরা। কোনো জলাশয়ে ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় জৈব আবর্জনার জটিল আণবিক গঠন ভেঙে সরল গঠনে যখন আসে, তখন ফস্‌ফোরাস্ এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত কিছু যৌগিক পদার্থও তৈরী হয়, যা'রা জলজ উদ্ভিদের

'খাদ্য' বা 'সার' হিসেবে আদর্শ। এই খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দিলে সেই জলাশয়ে জলজ উদ্ভিদেরও 'বিস্ফোরণ' হয়। আপাতদৃষ্টিতে এটা ভালোই মনে হবে; কারণ—বেশী উদ্ভিদ থাকা মানেই বেশী অক্সিজেন তৈরী হওয়া। কিন্তু, উদ্ভিদের আধিক্য দেখা দিলে তা'দের মৃত্যুর হারও বেড়ে যায়। প্রচুর মৃত উদ্ভিদের পচনে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্রুত খরচ হয়ে যেতে থাকে। জলচর প্রাণীরা হয় পালায়, অথবা মারা পড়ে। শেষ পর্যন্ত একটা সময় আসে যখন ঐ জলাশয়ে কোনো জলচর প্রাণীই আর থাকে না। জলে দুর্গন্ধ দেখা দেয়, এবং উদ্ভিদের আধিক্যে জলের রং গাঢ় (সাধারণত কালো) দেখায়। এই ঘটনাকে 'ইউট্রোফিকেশন' বলে। সমুদ্রতুল্য বিশাল কয়েকটি হ্রদে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ 'ইরী' এখন 'মৃত'। কৃষ্ণসাগর এবং বাল্টিক সাগরও কার্যত জলচর-প্রাণীহীন। এ সবই ঘটেছে চারপাশের কল-কারখানার নিক্ষিপ্ত আবর্জনায়। সাগর ও মহাসাগরগুলো এই মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রেখেছে তাদের সামগ্রিক বিশালতায়। কিন্তু, এ সব বুঝেও মানুষের পক্ষে সতর্ক হওয়া সম্ভব হয় নি; বরং উন্নতিশীল দেশগুলোতে কল-কারখানা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নততর হওয়ায় বিপজ্জনক জৈব আবর্জনার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি সমুদ্র দূষিত হওয়ার পরোক্ষ কারণ নিয়ে। মানুষ কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেও সমুদ্রকে দূষিত করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নেয় পেট্রোলিয়াম। পেট্রোলিয়াম প্রধানত তিনভাবে সমুদ্রের ক্ষতি করে। প্রথমত, পেট্রোলবাহী ট্যাঙ্কার যখন দুর্ঘটনায় প'ড়ে ডুবে যায়। এখন সারা পৃথিবীর সাগরে বড় এবং মাঝারি আকারের জাহাজ চলাফেরা করে পঞ্চাশ হাজারের বেশী। এর ভিতরে চার হাজারের বেশী হ'ল ট্যাঙ্কার। এদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে সমুদ্রে ডুবে যায়; আর তখন বিরাট পরিমাণ তেল ছাড়া পায় সমুদ্রে। আমেরিকান্ ট্যাঙ্কার "Torrey Canion" 1967 সালে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কাছে অগভীর জলের তলায় ধাক্কা খেয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়, এবং অন্তত 119,000 টন অশোধিত তেল ছাড়া পায় সমুদ্রে। ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের সমুদ্র-উপকূল তেলের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ দুই দেশের সরকার তেলের হাত থেকে উপকূল-অঞ্চল বাঁচাতে প্রায় উন্মত্তভাবে সবরকম চেষ্টা চালায়ঃ কাঠের গুঁড়ো, খড়, চকখড়ি ইত্যাদি শোষক

ছড়ানো, ন্যাপাম্-বোমার সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, পরিষ্কারক নানা কড়া বস্তু আকাশ থেকে ছিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুই করা হয়; কিন্তু, তা' সত্ত্বেও তেলের হাত থেকে একেবারে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। পরে দেখা যায়—শুধু তেলের জন্য সমুদ্র যতোটা দূষিত হ'তে পারতো, প্রতিষেধক ব্যবস্থায় সমুদ্রের ক্ষতি হয়েছে তা'র চেয়ে বেশী। এ ধরনের দুর্ঘটনা মোটেই বিরল নয়। 1970 সালে তিনটি ট্যাঙ্কার সমুদ্রে ডুবে যায়ঃ ক্যানাডার ট্যাঙ্কার "Arrow", নরওয়ের ট্যাঙ্কার "Polycommander" এবং লাইবেরিয়ার ট্যাঙ্কার "Marlena"। ফলে, যে পরিমাণ তেল সমুদ্রে ছাড়া পায়—তা' সামান্য নয়।

দ্বিতীয়ত, ট্যাঙ্কারে তেল বোঝাই করা এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছে তা' খালাস করা—এতেও প্রচুর তেল সমুদ্রে পড়ে। সব রকম সতর্কতার পরেও এ দুর্ঘটনা এড়ানো যায় না। প্রত্যেক বছরেই বিরাট পরিমাণ তেল সমুদ্রে যাতায়াত করে। তেল বেশী পাওয়া যায় এক দেশে, তা'র শোধন হয় অন্য দেশে; তেল বেশী উৎপাদন করে এক দেশ, বেশী ব্যবহার করে অন্য দেশ। এইসব কারণে প্রচুর ট্যাঙ্কার সব সময়েই সমুদ্রে যাতায়াত করে। হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে—এর জন্য বছরে দশ লক্ষ টন তেল সমুদ্রে পড়ে।

উপরের দু'টি কারণ বাদে তৃতীয় কারণও রয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি—সাম্প্রতিক কালে সমুদ্রের অগভীর তলা থেকে তেল বা'র করার ধুম লেগে গিয়েছে এবং বছরে সহস্রাধিক তেল-কূপ বসানো হচ্ছে। দুর্ঘটনাজনিত কারণে এই ধরনের তেল-কূপ থেকে প্রচুর তেল সমুদ্রে গিয়ে মেশে। যে দুর্ঘটনা এ বিষয়ে পরিবেশ-বিজ্ঞানীদের প্রথম সচেতন ক'রে তোলে তা' হ'ল 1969 সালে যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে সান্তা বারবারার কাছে তৈলাধার ফেটে যাবার ঘটনা। এই দুর্ঘটনার প্রথম একশো দিনে 11,900,000 লিটার তেল সমুদ্রে চ'লে যায়, এবং মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় এর প্রায় দশ গুণ। হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, প্রতি হাজারটি কূপের মধ্যে আড়াইটি কূপে এই জাতীয় ঘটনা ঘটে। উল্লিখিত তিন ধরনের দুর্ঘটনায় প্রতি বছর মোট এক কোটি টন তেল সমুদ্রে ছাড়া পায়।

তেল কীভাবে সমুদ্রের ক্ষতি করে; বিশেষত—তা'র দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির প্রকৃতি কী, সে বিষয়ে আমাদের ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। সমুদ্রের জীব-জগতের ক্ষতি সে করে, এবং আঞ্চলিকভাবে কোনো একটি বা দু'টি জীবের বিনাশ জীব-জগতে অসাম্য আনে। এই বিষয়টি শুনতে যতো সাধারণ মনে হ'তে

পারে, কার্যত তা' নয়। প্রাণিজগতে একটি সদস্যের অস্তিত্বের উপরে অন্যদের নির্ভরতার সূত্রগুলো প্রায়শই এত জটিল এবং সূক্ষ্ম যে মানুষের পক্ষে তা' আন্দাজ করা সম্ভব হয় না। কোনো একটি প্রাণীর আঞ্চলিক অবলুপ্তিতে শেষ পর্যন্ত বোঝা গিয়েছে তা'র গুরুত্ব। নিকট অতীতের কিছু ঘটনা এর সাক্ষী, যদিও এখানে আমরা কোনো দৃষ্টান্ত টেনে আনতে চাই না। দ্বিতীয়ত, পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে আমরা যে তথ্য জেনেছি তা' আবার স্মরণ করতে চাই। কোনো অজ্ঞাত কারণে সমুদ্রের জলে মিশ্রিত বস্তুর পরিমাণের বা অনুপাতের এখন আর বিশেষ তারতম্য হচ্ছে না; যদিও নদীগুলো অবিরলভাবে নতুন বস্তুর সম্ভার ঢেলে চ'লেছে সমুদ্রের বুকে, এবং যদিও অধিকাংশ বস্তুতেই সাগরের জল সম্পৃক্ত নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন—কোনো একটি বা দুটি বস্তুর অসম আনুপাতিক সংযোজন, বা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কোনো বস্তুর সংযুক্তি সমুদ্রের জলের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। যদি তাই হয়ে যায়, বর্তমানের সমুদ্রের জীব-জগৎ পূর্ণ বিনাশের সম্ভাবনার সামনে দাঁড়াবে। তেলের ধর্ম এই যে—জলের উপরে কোথাও সে স্থানবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ফলে সমস্ত সমুদ্রের জলে এখন তেলের একটা খুব পাতলা আস্তরণ তৈরী হয়ে গিয়েছে। এমন সব অঞ্চলে তেল চ'লে গিয়েছে—যেখানে সে দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারবে; ভারী কোনো যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়ে ডুবে যাবার সম্ভাবনা কম। যেমন হয়েছে তুন্দ্রা-অঞ্চলে। প্রকৃতি এখানে সাম্যের সূক্ষ্মতর নিয়ম মেনে চলে।

সমুদ্রদূষ্টির আরও নানা কারণ আছে; এদের ভিতরে আমরা শুধু তাপের সংযোজন নিয়ে কিছু আলোচনা করব। আজকাল শক্তি-সমস্যার যুগে নানা শক্তি-কেন্দ্র, বিশেষত—তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, তৈরী হচ্ছে প্রচুর। এসব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর জল চালনা করার প্রয়োজন হয়, এবং এই জল গরম হয়ে গেলে তা' ফেলে দিয়ে আবার নতুন জল নিতে হয়। বলা বাহুল্য গরম জল ফেলে দিতে হয় কোনো জলাশয়েই,—হ্রদে, নদীতে বা সমুদ্রে। উষ্ণ জলের সান্নিধ্যে ক্রমাগত থাকার ফলে ঐ জলাশয়ের উদ্ভিদের একটি বিশেষ অংশ মারা যায়, এবং—দুর্ভাগ্যবশত—এরাই 'বাঞ্ছিত' জলচর প্রাণীদের খাদ্য। উষ্ণ জলে উদ্ভিদপঙ্কের অন্য একটি শ্রেণী—যা'দের রং নীলচে সবুজ—অসম্ভব বংশবৃদ্ধি করে, কিন্তু—এতে অল্প যে কয়েকটি শ্রেণীর জলচর জীব বাঁচতে পারে

তা'রা মানুষের দৃষ্টিতে 'বাঞ্ছিত' নয়। উপরন্তু, বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভিদের আধিক্য ঐ জলাশয়ে যথারীতি 'ইউট্রোফিকেশন' ঘটাতে পারে।

সমুদ্রদূষ্টির পিছনে তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি কারণও রয়েছে, কিন্তু এই আলোচনা আমরা আর বিস্তৃত করতে চাই না। একটা প্রশ্ন অবশ্য আমাদের মনে অশান্তি তৈরি করে অনিবার্যভাবেই ঃ ঐ সব সমস্যা থেকে বাঁচবার পথ কী? এই প্রশ্ন বিশ্বময় পরিবেশ-বিজ্ঞানীদেরও ভাবাচ্ছে। গোপন ক'রে লাভ নেই—সমস্যাটি সমাধানের প্রায় অতীত। শহরের আবর্জনা নদীতে নিক্ষেপের আগে শোধন ক'রে নিতে পারলে সৎকাজ হ'ত নিঃসন্দেহে; কিন্তু, জনবহুল অঞ্চলে যে দ্রুততায় আবর্জনা জমে, সেই দ্রুততায় তা'কে শোধন করা দুঃসাধ্য কাজ। কল-কারখানার বর্জিত বস্তুর পরিমাণও অতি বিশাল, এবং তা' শোধনের ব্যয়বাহুল্য শিল্পপতিদের উৎসাহিত করে না। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু এমন ক্ষেত্র খুব বেশী নয়। তাপের সংযোজন অবশ্য বন্ধ করা সম্ভব। গরম জল ছেড়ে দেবার আগে কোনো আধারে খানিকক্ষণ রেখে দিলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু, এর উপরে সমুদ্রদূষ্টির সামান্যই নির্ভর করে। আগেই আমরা যা' বলেছি—তেলের সংযোজন বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং এর ক্ষতিকর ক্রিয়া কীভাবে কমানো যায়, তা' ভাবা যেতে পারে। উপর থেকে তেল তুলে নেওয়া, শোষক-পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া, এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ ফেলে দেওয়া যা'র সঙ্গে ক্রিয়া ক'রে তেল কোনো ভারী বস্তুতে পরিণত হয়ে ডুবে যায়,—এ সব ব্যবস্থা তো নেওয়া যেতেই পারে, সেই সঙ্গে চেষ্টা চলছে এক জাতীয় মাইক্রোব ব্যবহারের। এই মাইক্রোব তেল খেয়ে তা'কে কার্বন ডাই-অক্সাইড্, জল, প্রোটিন্ ইত্যাদিতে ভেঙে ফেলবে। অবশ্য, এই মাইক্রোবের ব্যাপক ব্যবহারের পরীক্ষা এখনও হয়নি।

● পরিশিষ্ট—2 ●

প্রাসঙ্গিক পরিভাষা পরিচিতি ও ব্যাখ্যা

সমুদ্র বিষয়ক আলোচনায় প্রয়োজন হ'তে পারে, এমন চল্লিশটি বৈজ্ঞানিক নামের অর্থ এখানে ইংরেজি বর্ণানুক্রমে দেওয়া হ'ল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিস্তৃত পরিচিতির সুযোগও দেওয়া হয়েছে। বাংলা পরিভাষা যথাসম্ভব 'চলন্তিকা' অনুগামী।

কুমেরুবৃত্ত (antarctic circle) ঃ দক্ষিণ-মেরুকেন্দ্রিক একটি বৃত্ত-রেখা, যা'র সাহায্যে দক্ষিণ-মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। এই বৃত্তের অক্ষাংশ ঃ দক্ষিণ 66°30′।

স্থিরপথ প্রতিবায়ু (anti-trade winds) ঃ প্রথমে **স্থিরপথ বায়ু (trade winds)*** দ্রষ্টব্য। উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষ-অঞ্চলমুখী, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা স্থিরপথ বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে নিরক্ষ-অঞ্চলমুখী, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা স্থিরপথ বায়ু মিলিত হয় [7-নং ছবি]। নিরক্ষ অঞ্চলে এই মিলিত বাতাস পৃথিবীর স্পর্শ ছেড়ে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বতর স্তরে ওঠে এবং
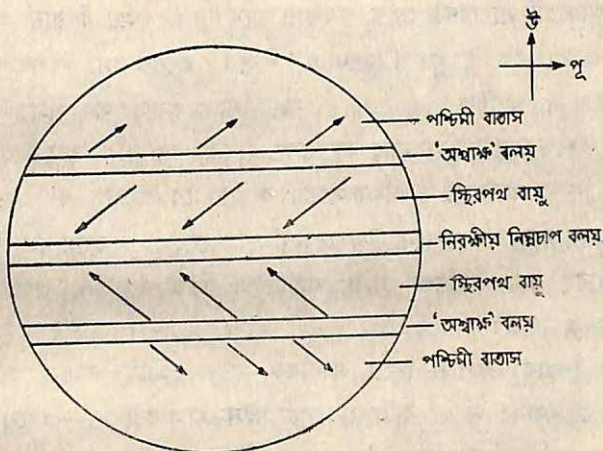
ছবি ঃ 7

[মেরু অঞ্চলের মেরু অতিগ বাতাস এখানে দেখানো হয়নি।]

স্থিরপথ বাতাসের অভিমুখের বিপরীত অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ঊর্ধ্বতর স্তরের এই বাতাসকে (উভয় গোলার্ধেই) 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু' বলে। দুই গোলার্ধেই এই বাতাস অশ্বাক্ষ (horse latitudes) বরাবর আবার নীচে নামে, এবং পৃথিবীর তল ঘেঁষে 'স্থিরপথ বায়ু' হিসাবে নিরক্ষ-অঞ্চল অভিমুখে চলে। অতএব পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছে যা 'স্থিরপথ বাতাস' নামে পরিচিত, তারই গতিপথের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় (দুই গোলার্ধেই) ঊর্ধ্বতর স্তরের প্রতি-

* 'চলন্তিকা'সিদ্ধ বাংলা ঃ ট্রেড বায়ু বা আয়ন বায়ু। কিন্তু, এতে ঐ বাতাসের মূল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয় না। ইংরেজি নামটি কিন্তু ঐ বাতাসের চরিত্রের বিশেষত্বদ্যোতক। 'স্থিরপথ বায়ু'র টীকা দ্রষ্টব্য।

বায়ুতে। দুই গোলার্ধের দুই অশ্বাক্ষ বরাবর ঐ প্রতিবায়ুর স্রোত দু'টি অত্যন্ত শুষ্ক অবস্থায় পৃথিবীর তল স্পর্শ করে, এবং মরুভূমির জন্ম দেয়।

সুমেরুবৃত্ত (arctic circle) ঃ উত্তর-মেরু কেন্দ্রিক একটি বৃত্ত-রেখা, যা'র সাহায্যে উত্তর-মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়। এই বৃত্তের অক্ষাংশ ঃ উত্তর 66° 30′।

বলয় শিরা (atoll) ঃ প্রথমে **শিরা (reef)** দ্রষ্টব্য। সমুদ্রের বুকে দৃশ্যমান বলয়াকার অথবা অশ্বক্ষুরাকৃতি শিরাকে 'বলয় শিরা' বলা হয়। সম্পূর্ণ আকারটি সাধারণত অভগ্ন অবস্থায় থাকে না। বলয় শিরায় আংশিক বেষ্টিত জলরাশিকে উপহ্রদ (lagoon) বলে। অনেক বলয় শিরার অন্তর্গত উপহ্রদে এক বা একাধিক দ্বীপ আছে। বলয় শিরার আকার সব সময়ে নিখুঁত বলয় বা অশ্বক্ষুরাকৃতির হয় না ; বহু ক্ষেত্রেই সুষম জ্যামিতিক চেহারার অভাব থাকে। কিন্তু, এ বিষয়ে উল্লিখিত সংজ্ঞা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয় না। বলয় শিরার বৃহত্ত্বেরও কোনো উচ্চ বা নিম্ন সীমা নেই। বৃহত্তম বলয় শিরাটি অবশ্য খুবই বড়,—আটশো চল্লিশ বর্গমাইল তা'র আয়তন, এবং মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত।

বলয় শিরার উৎপত্তি নিয়ে একাধিক মতবাদ আছে—যদিও কোনোটাই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়। চার্লস্ ডারুয়িইন্ মনে করতেন,—প্রথমে একটি দ্বীপ ঘিরে একটি সীমান্ত শিরা গ'ড়ে ওঠে। [11 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] তারপর কোনোও কারণে দ্বীপটি আস্তে আস্তে সমুদ্রে তলিয়ে যায় আংশিক বা সম্পূর্ণ-ভাবে। বাইরের শিরাটি বলয় শিরা হয়ে জেগে থাকে। কিন্তু, এই ধারণা অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।…গভীর সমুদ্রের বুকে যে সব বলয় শিরা দেখা যায়, তা'রা সম্ভবত মৃত এবং ডুবে-থাকা আগ্নেয়াগিরির উপরে গ'ড়ে উঠেছে। মার্শাল্ দ্বীপপুঞ্জের দু'টি বলয় শিরা Eniwetok এবং Midway-র জমি খুঁড়ে দেখা গিয়েছে—দু'টিরই ভিত্তি আগ্নেয়গিরি।

পর্যঙ্ক / অববাহিকা (basin) ঃ পৃথিবীর বুকে বিস্তীর্ণ খাত বা গর্ত—সমুদ্র বা হ্রদের জল যা' অধিকার ক'রে রেখেছে। কার্যত, সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশকেই 'basin' বলা হয়। [এই শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক ; আমরা কেবল উল্লিখিত অর্থেই আগ্রহী।]

গভীরতা মাপন (bathymetry) ঃ সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপের শাস্ত্র। অতীত যুগে গভীরতা পরিমাপের উপায় ছিল—শক্ত দড়িতে বেঁধে কোনো ভারী বস্তুকে জলে নামিয়ে দেওয়া। ঐ বস্তু নীচে ঠেকলে দড়ির প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য মেপে নেওয়া হ'ত। এই পদ্ধতি কেবল সময়-সাপেক্ষই নয়, অন্যভাবেও আপত্তিকর ছিল। সমুদ্রের গভীরে স্রোত থাকার ফলে অনেক সময়ে ঐ বস্তু সোজাসুজি নীচে নামত না; স্রোতের টানে অনেকটা দূরে গিয়ে তারপর তলায় ঠেকতো, এবং জলের উপর থেকে পরীক্ষকদের চোখে এটা ধরা পড়ত না। পরবর্তী যুগে শব্দের প্রতিধ্বনি গ্রহণের পদ্ধতি চালু হয়। এই পদ্ধতিরও কিছু আপত্তিকর দিক আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও এই পদ্ধতিই ব্যাপকভাবে চালু আছে। অবশ্য, প্রথম চালু হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর যথেষ্ট আধুনিকীকরণ হয়েছে।...সাগর-তলার গভীরতাজ্ঞাপক মানচিত্রকে bathymetric map বলে। সাধারণত সমোন্নতি রেখার (contour line-এর) সাহায্যে এই মানচিত্র আঁকা হয়।

গভীরযান (bathyscaphe) ঃ এক ধরনের জলযান, গবেষণার প্রয়োজনে যা' সাগরের যে কোনো গভীরতায় নামতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডের পদার্থবিদ্ পিকার্ড্ (Auguste Piccard) এই যানের উদ্ভাবক। 1948 সালে এই যান প্রথম জলে নামে বিনা আরোহীতে। এই যানের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার কক্ষে দুই বা তিন জন মানুষ কোনোক্রমে অবস্থান করতে পারে। যানটির অধিকাংশ আয়তন জুড়ে থাকে গ্যাসোলিনের অনেকগুলো কক্ষ। এদের এবং ব্যালাস্টের সাহায্যে যানটি জলের গভীরে ডুবতে পারে, কিংবা উপরে উঠে আসতে পারে। মোটর-চালিত পাখার (propeller-এর) সাহায্যে যানটি জলের গভীরেও যে কোনো অভিমুখে ধীর গতিতে চলতে পারে। সমুদ্রের গভীরের অন্ধকার জলকে আলোকিত করার ব্যবস্থা থাকে, এবং উল্লিখিত গোলাকার কক্ষের কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য কিছু দূর অবধি দেখা যায়। এই ধরনের গভীরযানে দুই অভিযাত্রী সাগরের গভীরতম বিন্দুতে প্রথম নেমেছিলেন 1960 সালে। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।]

আদি গভীরযান (bathysphere) ঃ সমুদ্রের গভীরের দৃশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য গোলাকার কক্ষ। ইস্পাতের তৈরী এই কক্ষে দু'জন অভিযাত্রীর স্থান হয়। এই কক্ষের সংলগ্ন কোনো মোটর বা এঞ্জিন থাকে না। সাগরের বুকে

ভাসমান কোনো জলযান থেকে শক্ত দাঁড়ির সাহায্যে এই গোলক জলের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হয়। বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে গভীরের অন্ধকার জলকে
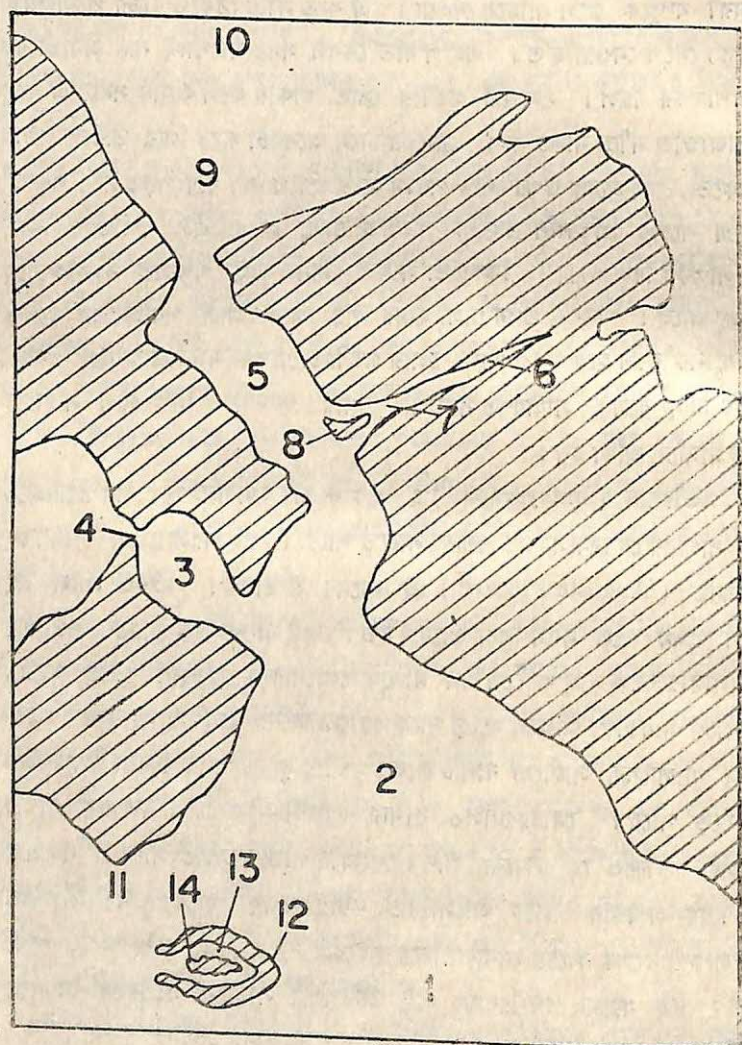
ছবি : ৪

1, 10 মহাসাগর, 2, 9 সাগর বা উপসাগর, 3 উপসাগর, 4 প্রণালী (strait), 5 প্রণালী (channel), 6 নদী, 7 খাঁড়ি (estuary), 8 ব-দ্বীপ, 11 অন্তরীপ, 12 বলয়-শিরা, 13 উপহ্রদ, 14 দ্বীপ

কিছুদূর অবধি আলোকিত করা যায়, এবং কাচের বা গলিত কোয়ার্জের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। এই গোলকের সঙ্গে কোনো এঞ্জিন না-থাকায় আশেপাশে কোনোদিকে এগোতে পারে না ; এবং উপরের জাহাজের সঙ্গে সংযোগকারী দড়ি ছিঁড়ে গেলে আর উঠে আসতেও পারে না। এই ধরনের গোলকের সাহায্যে প্রথমে সাগরের গভীরে নামেন উইলিয়াম বীব্ (William Beebe) 1930 সালে। উদ্দেশ্য ছিল—সাগরের গভীরের জীবজন্তু দেখা। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

উপসাগর (bay) : সমুদ্রের সুবিস্তৃত খাড়ি। হ্রদের ক্ষেত্রেও 'bay' শব্দটি প্রযোজ্য। কতখানি বিস্তৃতি যথেষ্ট, এ সম্পর্কে সংজ্ঞাগত নির্দেশ কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে উপসাগর (gulf)-ও দ্রষ্টব্য।

অন্তরীপ (cape) : সমুদ্রের বুকে প্রলম্বিত কোনো দেশ বা মহাদেশের শীর্ষভাগ। [8 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ শীর্ষ—হর্ন্ অন্তরীপ ; ভারতবর্ষের দক্ষিণ শীর্ষ—কুমারিকা অন্তরীপ ; ইত্যাদি।

প্রণালী (channel) : সমুদ্রের একটি অপ্রশস্ত অংশ (দুই দেশ বা মহাদেশের মধ্যবর্তী)—দু'টি বিস্তীর্ণ সাগরকে যা' যুক্ত করে। প্রণালী (strait)-ও দ্রষ্টব্য। [ছবি : 8]

কূল/উপকূল (coast) : কোনো স্থলভাগের প্রান্তদেশ—সমুদ্র বা অন্য কোনো বিস্তীর্ণ জলরাশিকে যা' স্পর্শ করে। এরও শ্রেণীবিভাগ আছে : concordant coast এবং discordant coast ; কিন্তু, এ আলোচনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

মহাদেশিক তাক (continental shelf) : উপকূলবর্তী সমুদ্রের অগভীর তলদেশ ; সাধারণত, তীর থেকে এক হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রের তলা। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং 1 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] এর বিস্তৃতি স্থান বিশেষে বিভিন্ন ; গভীরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে এই 'তাক' অপ্রশস্ত হয়।

মহাদেশিক ঢাল (continental slope) : উল্লিখিত 'মহাদেশিক তাক-' এর পর থেকে দশ হাজার ফুট গভীরতা পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশ। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এবং 1 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] এর বিস্তৃতিও স্থান হিসাবে বিভিন্ন। যে অঞ্চলে গভীরতা (হাজার ও দশ হাজার ফুটের মধ্যবর্তী গভীরতা) আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে মহাদেশিক ঢাল সুবিস্তৃত ; যেখানে গভীরতা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়—সেখানে অবশ্যই অত বিস্তৃত নয়।

কূপ (deep) ঃ সমুদ্রের নীচের গভীর খাত বা গহ্বরের (trench-এর) ভিতরের আকস্মিক গভীর অংশকে সাধারণত 'deep' বলা হয়। কিন্তু, খাতের ভিতরে না-হয়ে সমুদ্রের তলায় যে কোনো অঞ্চলেও কূপ (deep) থাকতে পারে। অবশ্য, খাত বা গহ্বরগুলো দৈর্ঘ্যে খুব ছোট হ'লেই তা'রা কার্যত কূপ হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর গভীরতম বিন্দুটি অবস্থিত Mariana Trench-এর অন্তর্গত Challenger Deep-এ। বলা বাহুল্য, deep বা কূপের চারপাশের 'দেয়াল' খুবই ঢালু—প্রায় লম্ব—হয়।

অবক্ষেপ (deposition) ঃ জল অথবা বাতাসে প্রাকৃতিকভাবে বাহিত বস্তু-কণা থিতিয়ে পড়ার ঘটনা, কিংবা ঐ থিতিয়ে পড়া বস্তুকে অবক্ষেপ বলে। নদীর জল পৃথিবীর বুক ধুয়ে অনেক সূক্ষ্ম কণিকা এবং পাথরের টুকরো হ্রদে বা সমুদ্রে নিয়ে ফেলে, এবং তারপর ঐ বস্তু-কণা ধীরে ধীরে জলাশয়ের নীচে জমা হয়। একইভাবে, বাতাস বাহিত বস্তুকণাও জলে অথবা জমির উপরেই থিতিয়ে পড়ে। Deposition-শব্দটির প্রয়োগ আরও ব্যাপক, কিন্তু, আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে তা' অনাবশ্যক।

নিম্নচাপ বলয় (doldrums) ঃ পৃথিবীর নিরক্ষরেখাবর্তী নিম্ন বায়ুচাপের অঞ্চল। উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা 'স্থিরপথ বায়ু' (trade winds) নিরক্ষ-অঞ্চলে মিলিত হয়ে উপরে উঠে যায়। এ কারণে, এই অঞ্চল প্রধানত বাতাসহীন, এবং বায়ু-চাপও কম। (এই অঞ্চলের বাতাসের উচ্চতর স্তরে ওঠার পিছনে এই অঞ্চলের প্রখর সূর্য-রশ্মির বিশেষ ভূমিকা আছে।) কিন্তু, এখানে প্রচণ্ড ঝড় মোটেই বিরল নয়, এবং বৃষ্টিপাত হয় প্রচুর। (বাতাস উপরে উঠে খুব ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াই প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ।) পাল-তোলা জাহাজের যুগে নিরক্ষ অঞ্চলের সমুদ্রকে এড়িয়ে চলা হ'ত বাতাসহীনতার জন্য। মোটামুটিভাবে নিরক্ষরেখার অঞ্চলে অবস্থান করলেও এই নিম্নচাপের অঞ্চলের অবস্থান বছরের বিভিন্ন সময়ে কিছুটা স'রে যেতে পারে সূর্যের ভ্রমণপথের পরিবর্তন অনুসারে, যদিও সূর্য যতখানি স'রে যায় ততটা নয়। [নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের অবস্থান 7নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।]

খাড়ি (estuary) ঃ নদীর মোহনা—যেখানে সমুদ্রের জোয়াড়-ভাঁটার ক্রিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় এবং যেখানে নদীর জল লবণাক্ত জলে এসে মেশে।

[বাংলায় 'খাড়ি' শব্দের প্রয়োগ অবশ্য ইংরেজী 'estuary'-র চেয়ে ব্যাপক।] সংজ্ঞার নির্দেশ অবশ্য সব সময়ে পুরোপুরি মানা হয় না। স্থলভাগে আংশিকভাবে আবদ্ধ সমুদ্রের ক্ষুদ্র অংশকেও 'estuary' বলা হয়। এই ধরনের খাড়ির জলের লবণাক্ততা সংলগ্ন সমুদ্রের জলের থেকে কম, বেশী বা অভিন্ন হ'তে পারে। (এটা নির্ভর করবে ঐ খাড়িতে এসে-পড়া নদীর জল এবং ঐ খাড়ি থেকে বাষ্প হয়ে-যাওয়া জলের পরিমাণের আনুপাতিক বেশী-কমের উপরে।) এই অনুসারে ঐ খাড়িকে যথাক্রমে ধনাত্মক (positive), ঋণাত্মক (negative) বা নিরপেক্ষ (neutral) বলা হয়। লক্ষণীয়, এই দ্বিতীয় সংজ্ঞায় 'খাড়ি' এবং 'উপহ্রদ' কার্যত অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এসব ক্ষেত্রে খাড়িকে উপকূলবর্তী উপহ্রদও বলা যায়। এই ধরনের উপকূলবর্তী উপহ্রদের অনেক বৈশিষ্ট্য মূল সমুদ্রের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেকাংশে আলাদা হওয়ায় 'estuarine oceanography' নামে সমুদ্র-বিজ্ঞানের একটি শাখারও উদ্ভব হয়েছে।

ফ্যাদম্ (fathom) ঃ দৈর্ঘ্যের একক। এক ফ্যাদম=ছয় ফুট। সমুদ্রের গভীরতা মাপার কাজে এই একক এক সময়ে বহুলভাবে ব্যবহৃত হ'ত। এখনও এই একক অপ্রচলিত হয়ে যায়নি।

হিমবাহ (glacier) ঃ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পর্বতের হিম-রেখার (snow line-এর) উপর থেকে উপত্যকাপথে ধীরে ধীরে ব'য়ে আসা তুষাররাশি। হিমবাহর গভীরতা সাধারণত (নদীর তুলনায়) বেশী হয়, এবং একেবারে নীচের স্তরের তুষার উপরের স্তরের চাপে গ'লে যেতে পারে,—যেহেতু চাপের ফলে হিমাঙ্ক (freezing point) আরও নেমে যায়। হিমবাহ সাধারণত তুষার-রেখা ছাড়িয়ে নেমে আসে অনেক নীচে, এবং উষ্ণতার আধিক্যে গলতে থাকে। এই গলনের পরিমাণ এবং উপর থেকে নেমে আসা তুষারের পরিমাণ যেখানে এসে সমান হয়, সেই অবধি নেমে হিমবাহ শেষ হয়। হিমবাহর অগ্রসর হবার গতি খুব সামান্য ; অনেক হিমবাহ আদৌ অগ্রসর হয় না ; এবং পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্তও আছে। এ সম্পর্কে এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। Glaciology বা 'হিম-বিজ্ঞান' হিমবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে।

উপসাগর (gulf) ঃ **উপসাগর (bay)** দ্রষ্টব্য। অভিধান অনুসারে বৃহৎ bay-কে gulf বলা উচিত। কিন্তু, বাস্তবে প্রায়ই বিপরীত ঘটনা লক্ষ করা

যায়। Persian Gulf, Gulf of Aden, Gulf of Bothnia ইত্যাদির তুলনায় Bay of Bengal, Hudson Bay ইত্যাদি অনেক বড়।

অশ্বাক্ষরেখা (horse latitudes) ঃ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের দু'টি উচ্চ-চাপ বলয়। প্রত্যেক গোলার্ধে এই অঞ্চল কার্যত 'স্থিরপথ বায়ু' এবং 'পশ্চিমী বায়ু'র (Westerlies-এর) মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত। [7 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] উত্তর গোলার্ধের এই অঞ্চলে 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু' উঁচু স্তর থেকে নীচে নামে এবং 'স্থিরপথ বায়ু'তে পরিণত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে যায়। ['স্থিরপথ বায়ু' (trade winds) এবং 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু' (anti-trade winds) দ্রষ্টব্য।] একই সঙ্গে পশ্চিমী বাতাস (Westerly) এই অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্ব অভিমুখে চলে। [7 নং ছবি দ্রষ্টব্য।] দক্ষিণ গোলার্ধেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। দু'টি বায়ুস্রোতের মধ্যবর্তী এই অঞ্চল বাতাসহীন বা মৃদু বাতাসের অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। এই অঞ্চলের নামকরণে 'অশ্ব'র উপস্থিতির কারণ ঠিক বোঝা যায় না। অনেকে মনে করেন,—অতীতের পাল-তোলা জাহাজের যুগে এই অঞ্চলে জাহাজ এসে পড়লে বাতাসের অভাবে দীর্ঘকাল গতিহীন হয়ে থাকত। তখন আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চালানের জন্য যে সব ঘোড়া জাহাজে মজুত থাকত, তাদের সমুদ্রে ফেলে দিতে হ'ত খাদ্যের অভাবে। সেই ঘটনা থেকে না কি ঐ নামের উৎপত্তি। নিরক্ষ অঞ্চলের 'নিম্নচাপ বলয়ের' (doldrums-এর) মতো অশ্বাক্ষরেখারও অবস্থানের সাময়িক পরিবর্তন হয় সূর্যের গতিপথ অনুসারে।

হিমশৈল (iceberg) ঃ সাগরচুম্বী গ্লেসিয়ার্ অথবা কোনো উপকূলবর্তী তুষারের তাক (shelf) থেকে ভেঙে সমুদ্রে ভেসে থাকা তুষারস্তুপকে হিমশৈল বা iceberg বলা হয়। উত্তর গোলার্ধে সাগরচুম্বী গ্লেসিয়ার্ (হিমবাহ) অজস্র আছে গ্রীণ্ল্যাণ্ডে। এইসব হিমবাহে বয়ে-নামা তুষার ক্রমশই বেশী পরিমাণে সাগরের বুকে ঠেলে আসে অখণ্ড তুষারধারার মতো। অবশেষে এক সময়ে প্রক্ষিপ্ত অংশ নিজের ওজনের চাপে ভেঙে গিয়ে বিচ্ছিন্ন তুষারস্তুপ হয়ে ভাসতে থাকে। উত্তর গোলার্ধে প্রতি বছরে সৃষ্ট কম-বেশী ষোলো হাজার তুষারস্তুপের শতকরা নব্বইটি গ্রীণ্ল্যাণ্ডের হিমবাহগুলোর অবদান। এদের ভিতরে দশ লক্ষ টন ওজনের হিমশৈলও একান্ত বিরল নয়। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ মহাদেশের উপকূলে তৈরী-হওয়া তুষারের

প্রলম্বিত বিস্তৃতি ভেঙে যে হিমশৈল তৈরী হয়, তা' আরও অনেক বেশী অতিকায় হয়ে থাকে।

হিমশৈলের আপেক্ষিক গুরুত্বর (বা ঘনত্বর) কম-বেশী হয়ে থাকে ; গড় ঘনত্ব মোটামুটি 0·89 হয়। এর ফলে জলের উপরে ভেসে থাকা অংশটি মোট পরিমাণের আট ভাগের এক-ভাগের মতো হয়। চেহারার উপর নির্ভর ক'রে হিমশৈলের শ্রেণী-বিভাগের রীতি আছে। হিমশৈলের জীবনকাল অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের হ'তে পারে ; যদি মেরু অঞ্চলের সমুদ্রেই ভেসে থাকে, তবে অবিশ্বাস্য দীর্ঘকালও টিঁকে থাকা সম্ভব। কিন্তু, সমুদ্রের স্রোতে ভেসে উষ্ণতর অঞ্চলে এলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গলতে থাকে। 40° থেকে 50° F উষ্ণতার জলে মোটামুটি কয়েক সপ্তাহ, এবং আরও উষ্ণ জলে এলে কয়েক দিন অবধি এদের অস্তিত্ব রক্ষা পেতে পারে। ভাসতে ভাসতে জাহাজের চলা-ফেরার অঞ্চলে এসে পড়লে এরা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় ; আগেকার যুগের অনেক জাহাজ অতিকায় হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে গেছে।

হিমমুকুট (ice-cap | ice sheet)ঃ মেরু অঞ্চলে স্থলভাগের উপরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তুষারের গভীর স্তর। উত্তর গোলার্ধে গ্রীণ্‌ল্যাণ্ড এবং দক্ষিণে দক্ষিণ মহাদেশের হিমমুকুটই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমমুকুটের উপরের অংশ মোটামুটি সমতল। গ্রীণ্‌ল্যাণ্ডের হিমমুকুট ঐ দেশের প্রায় সবটা অধিকার ক'রে আছে—কিছু কিছু উপকূলবর্তী অঞ্চল বাদে। কিন্তু, দক্ষিণ মহাদেশের হিমমুকুট ঐ মহাদেশের সীমা ছাড়িয়েও সমুদ্রে কিছুটা প্রলম্বিত হয়ে আছে। হিমমুকুট অনেক অঞ্চলে কয়েক হাজার ফুট পুরু।···Ice cap এবং ice sheet সাধারণত সমার্থক হিসাবে গণ্য হ'লেও অনেকে প্রথম নামটি ক্ষুদ্র আকৃতির ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রে থাকেন।

তুষারদ্বীপ (ice island)ঃ সুমেরু অঞ্চলের সমুদ্রে ভাসমান অতিকায় এবং অস্বাভাবিক পুরু তুষারস্থান। হিমশৈলের তুলনায় তুষারদ্বীপ অনেক বেশী মসৃণ ; এবং যে তুষারাঞ্চল সুমেরুর বিশাল বিস্তারের বৈশিষ্ট্য, তা'র তুলনায় তুষারদ্বীপের অভগ্ন চেহারাই প্রথমে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুষারদ্বীপ কয়েকশো বর্গমাইল আয়তনেরও হয়ে থাকে, এবং দু'শো ফুট পর্যন্তও পুরু হয়। তুষারদ্বীপের জন্ম হয় মূলত উত্তর কানাডার দ্বীপপুঞ্জে এবং গ্রীণ্‌ল্যাণ্ডের উত্তর উপকূলে। স্থলসংলগ্ন বরফ আস্তে আস্তে বিস্তৃত হয়ে এক সময়ে স্থল থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়, এবং এই ধরনের দ্বীপের জন্ম দেয়। তুষারদ্বীপ সর্বপ্রথম লক্ষ করা হয় 1946 সালে, এবং সেই থেকে প্রায় একশোটি দ্বীপ লক্ষ করা গিয়েছে। তুষারদ্বীপের জীবনকাল অস্বাভাবিক দীর্ঘ। 1946 সালে আবিষ্কৃত দ্বীপটি আজও একই অবস্থায় আছে। গত 1961-62 সালে পাঁচটি বৃহৎ তুষারদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে ওয়ার্ড হাণ্ট তুষার-তাক (Ward Hunt Ice Shelf) ভেঙে গিয়ে। স্থল-সংলগ্ন অবস্থায় প্রথমে গ'ড়ে ওঠে বলেই এদের পক্ষে অস্বাভাবিক পুরু হওয়া সম্ভব। একশো ফুট পুরু হ'তে একটি তুষার-তাক বা ice shelf-এর কয়েক শতাব্দী লেগে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সুমেরুর সাধারণ তুষার-আচ্ছাদনের পুরুত্ব 20 ফুটের বেশী নয়!

সমপ্রেষ-রেখা (isobar) : কোনো স্তরে বা তল-এ যে সব বিন্দুতে চাপ সমান (বাতাসের চাপ বা জলের চাপ) সেই সব বিন্দুর সংযোগকারী রেখা। নির্দিষ্ট ব্যবধানের বিভিন্ন চাপের জন্য অনেকগুলো সমপ্রেষ-রেখা মানচিত্রে দেখানো চলে।…'bar' চাপের একক (মূলত, বাতাসের চাপের)। 45° অক্ষরেখায় 0°C উষ্ণতার 750·1 মিলিমিটার দীর্ঘ পারদ-স্তম্ভের চাপকে এক 'বার' ধরা হয়।

ছবি : 9
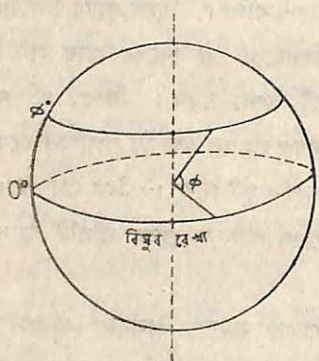
পৃথিবীর অক্ষরেখা। ϕ ডিগ্রী কোণ-এর অক্ষরেখাটি দেখান হয়েছে। অবশ্য বিষুবরেখাটিও একটি অক্ষরেখা।

ছবি : 10
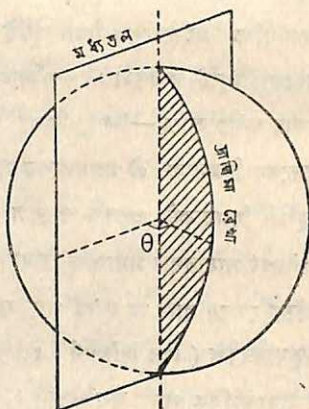
পৃথিবীর দ্রাঘিমারেখা। θ° কোণ-এর দ্রাঘিমারেখাটি দেখান হয়েছে।

সমোষ্ণতা রেখা (isotherm) : কোনো স্তরে বা তল-এ সমান উষ্ণতাসম্পন্ন বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখা।

অক্ষাংশ / অক্ষরেখা (latitude) ঃ পৃথিবীর তল-এ কোনো বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব—বিষুবরেখার সাপেক্ষে। ঐ কোণকে ঐ বিন্দুর অক্ষাংশ বলে। সমান কোণবিশিষ্ট বিন্দুগুলোর সংযোগকারী রেখাকে line of latitude বা অক্ষরেখা বলে ; সংক্ষেপে শুধু latitude-ও বলা হয়। [ছবি ঃ 9]

লীগ্ (league) ঃ দৈর্ঘ্যের একক। বর্তমানে অপ্রচলিত। এক লীগ্ = তিন মাইল বা 4·8 কিলোমিটার। ('সমুদ্রের কুড়ি হাজার লীগ নীচে' নামার প্রশ্নই ওঠে না !)

দ্রাঘিমা (longitude) ঃ পৃথিবীর তল-এ কোনো বিন্দুর কৌণিক দূরত্ব—একটি বিশেষ মধ্যতলের (meridian-এর) সাপেক্ষে। সমান কৌণিক-দূরত্ব বিশিষ্ট বিন্দুগুলির সংযোগকারী রেখাকেও দ্রাঘিমা বলে। ঐ বিশেষ মধ্যতলটি গ্রীনীচ্-এর মধ্য দিয়ে যায় ব'লে ধরা হয়। [ছবি ঃ 10]

সামুদ্রিক মাইল (nautical mile) ঃ সমুদ্র-যাত্রায় ব্যবহৃত দূরত্বের (দৈর্ঘ্যের) একক। এক সামুদ্রিক-মাইল = 1·1508 মাইল = 1·8520 কিলোমিটার। এই অনুসারে, কোনো জলযানের গতিবেগ এক নট্ (knot) —এ কথার অর্থ ঃ প্রতি ঘণ্টায় এক সামুদ্রিক মাইল (বা সেকেণ্ডে 0·5144 মিটার) গতিবেগ।

সামুদ্রিক মাইলের সংজ্ঞা এইভাবে নির্ধারিত হয়। পৃথিবীর সমান ক্ষেত্রফলের একটি গোলক বিবেচনা করা যাক। এই গোলকের যে কোনো একটি গুরুবৃত্তের (great circle-এর) কেন্দ্রে 1′ (এক মিনিট) কোণ ঐ বৃত্তের পরিধির যে দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে, তা'ই এক সামুদ্রিক-মাইল।—[ভৌগোলিক মাইলের সংজ্ঞাও অনুরূপভাবে নির্ধারিত হয় বিষুব রেখা-বৃত্তের বিবেচনায়। ফলে, অধিকাংশ বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দু'টি একককে প্রায় সমান (এবং 6080 ফুট) মনে করা যায়।] সাধারণ 'মাইল'-এর সংজ্ঞা অবশ্য অন্য-ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

সমুদ্র-বিজ্ঞান (oceanography) ঃ সমুদ্র-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনার শাস্ত্র। সমুদ্রের জলের বিশ্লেষণ, স্রোত, উষ্ণতা, গভীরতা, তলদেশ, উদ্ভিদ এবং জন্তু, আবহাওয়া ইত্যাদি সব কিছুই এই শাস্ত্রের অন্তর্গত। সুতরাং, এই বিজ্ঞান বস্তুত একটি শাস্ত্র নয় ; অনেক শাস্ত্রের (যথা ঃ ভূ-বিজ্ঞান, আবহাওয়া-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ফলিত গণিত,

ইত্যাদির) সহাবস্থান। এমনকি, সমুদ্রের উৎপত্তির ইতিহাস এবং পরিবেশ-বিজ্ঞানও এখানে স্থান পায়।

'সমুদ্র-বিজ্ঞান' নামে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান কার্যত গ'ড়ে ওঠে মধ্য উনবিংশ শতাব্দী থেকে। ম্যাথু ফণ্টেন্ মরি-র 'Physical Geography of the Sea'-কে এই বিষয়ের প্রথম পাঠ্য-বই ব'লে মনে করা যায়। এর আগেও এই বিজ্ঞান নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে আসছিল অনেক দিন থেকে, কিন্তু সচেতনভাবে নয়। ফ্রোবিশার (Frobisher), ডেভিস্ (Davis), হাড্‌সন্ (Hudson), ব্যাফিন্ (Baffin), বেরিং (Bering), কুক্ (Cook), রস্ (Ross), আমুণ্ড্‌সেন্ (Amundsen) ইত্যাদি আদি অভিযানকারীরা নতুন সমুদ্র-পথ খুঁজতে গিয়ে সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেন। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট মেরু-অভিযাত্রীরা এই জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেন। কিন্তু এই সময়ে ভূগোল বাদে অন্য কোনো দিক নিয়ে তেমন মাথা ঘামানো হ'ত না। উনবিংশ শতাব্দীর কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী—এরেন্‌বার্গ্ (Ehrenberg), হুম্‌বোল্ট্ (Humboldt), হুকার্ (Hooker), ওয়েরস্টেড্ (Oerstedt), ইত্যাদি—সমুদ্রের প্রাণী-সমাজ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেন। চার্ল্‌স্ ডারুয়িন্ (Charles Darwin)-এর প্রবাল-শিরার পর্যবেক্ষণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে গণ্য হয়। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিন এবং ফণ্টেন্ মরি-র স্মরণীয় উদ্যোগের কথা এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সমুদ্রমালাকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণের রীতি শুরু হয়, এবং কার্যত এটাই আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞানের সূচনা। ফর্‌বেস্ (Forbes) এবং মরি (Maurey)-র অনুসন্ধানের পর থেকে বহু পর্যবেক্ষক এবং বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। অনেক দেশের সংস্থার এবং ব্যক্তিগত অনেক জাহাজ এই কাজে লাগানো শুরু হয়। আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞান বস্তুত কোনো ব্যক্তি-বিশেষের কিংবা কোনো জাহাজের আকস্মিক পর্যবেক্ষণকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। পরিবর্তে, সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণার পরিচিত সংস্থার উদ্যোগে যে সব জাহাজ দীর্ঘকালীন অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকে, তা'দেরই ইদানীং গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি 'উড্‌স্ হোল্ ওসেনোগ্রাফিক্ ইন্‌স্টিটিউসন্'-এর জাহাজ Atlantis II, 'স্ক্রিপ্‌স্ ইন্‌স্টিটিউসন্ অব্ ওসেনোগ্রাফি'র জাহাজ Argo, 'ল্যামণ্ট জিওলজিক্যাল অব্‌জারভেটরি'র Vema, ফরাসী জাহাজ Calypso,
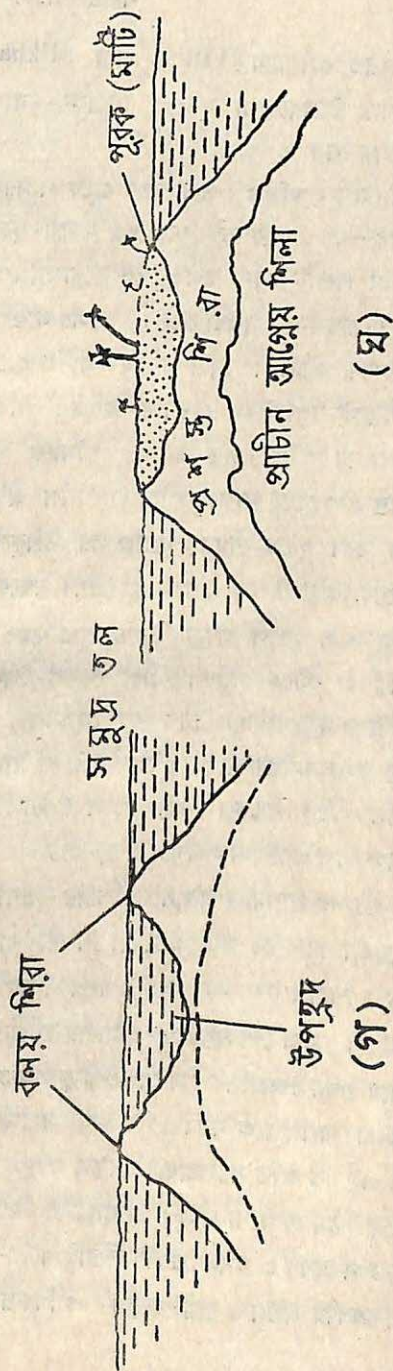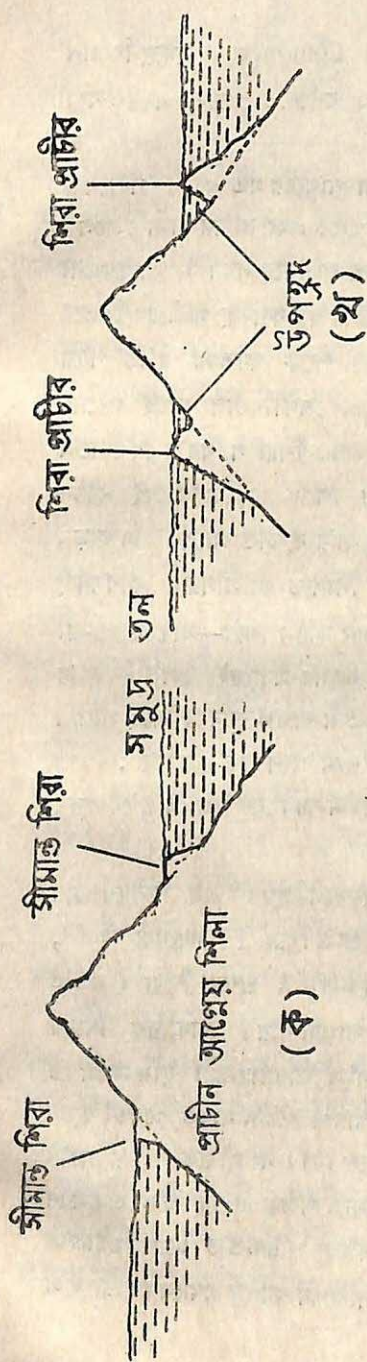
ছবি 11 : প্রধানত এই চার ধরনের 'শিরা' দেখা যায়। ডারউইন মনে করেছিলেন, বিবর্তনের ধারায় এরা আবদ্ধ—ছবিতে পরপর যেমন দেখান হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার Vittiaz এবং Mikhail Lomonosov সমুদ্র-বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে,—যদিও ব্যক্তিগত প্রয়াস এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি।

শিরা (reef)ঃ জলাশয়ের বুকে পাথর বা পাথরের মত কঠিন পদার্থের প্রাচীর—যা' সাধারণত জোয়ারের সময়ে ডুবে থাকে এবং ভাঁটায় মাথা তোলে। ('reef' শব্দটি অবশ্য স্থলভাগেও প্রযোজ্য, কেবল জলাশয়ে নয়।) এর কোনো কঠোর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নেই। জলের মুক্ত তলের ছয় ফ্যাদম্ গভীরের ভিতরে যে কোনো কঠিন পদার্থের অস্তিত্ব—যা' জাহাজের পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে —তা'কেই 'শিরা' বলার রীতি আছে। শিরার শ্রেণীবিভাগ আছে গঠনের উপাদানের উপর ভিত্তি ক'রে। নিছক পাথরের শিরা পৃথিবীর যে কোনো সমুদ্রে এবং হ্রদেই থাকতে পারে। বালি জ'মে গিয়ে প্রাকৃতিকভাবেই কঠিন শিরা তৈরী হ'তে পারে,—ব্রাজিলের উপকূলে যা'র দৃষ্টান্ত আছে। এ ছাড়া, সমুদ্রের কিছু উদ্ভিদ এবং অন্য প্রাণী থেকে নিঃসৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেট্ থেকে তিলে তিলে গ'ড়ে উঠতে পারে বৃহৎ এবং কঠিন শিরা—যা'দের আমরা জৈব-শিরা বলতে পারি। এরা কেবল উষ্ণ জলের সমুদ্রেই সুলভ। ক্ষুদ্র প্রাণীদের মৃতদেহের কঠিন অংশ জৈব-শিরা গঠনে যথেষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের মৃত্যু হ'লে তা'র শরীরের নরম অংশ নষ্ট হয়ে যায় ; কিন্তু কঙ্কাল প'ড়ে থাকে। এই কঙ্কাল (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) জ'মে জ'মে বৃহৎ প্রবাল-দ্বীপ এবং প্রবাল-শিরা গ'ড়ে ওঠে।

গঠনের জ্যামিতি অনুসারে শিরার শ্রেণী-বিভাগ হয়। এই হিসাবে চার রকমের শিরা হ'তে পারে ঃ সীমান্ত-শিরা বা প্রান্ত-শিরা (fringing reef), প্রাচীর-শিরা (barrier reef), বলয় শিরা (atoll), প্রশস্ত শিরা (table reef)। নাম থেকেই এদের চেহারার পরিচয় পাওয়া যায়। সামুদ্রিক শিরার বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কৃতিত্ব চার্ল্‌স্ ডারুয়িনের। ইনি উল্লিখিত চার শ্রেণীর শিরাকে বিবর্তনের একটি ধারায় আবদ্ধ করেন, যদিও পরবর্তী যুগে তাঁর এই মত অতি সরলতাদুষ্ট ব'লে গণ্য হয়েছে। 11 নং ছবিতে পরপর চারটি শিরার গঠন দেখানো হ'ল। ডারুয়িনের কল্পনাও পাঠক এখান থেকে অনুসরণ করতে পারবেন ঃ প্রথম শ্রেণীর শিরাই ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে পর্যায়ক্রমে শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সবিশেষ ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হ'ল

না। ডারুয়িনের তত্ত্ব কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায় না, কিংবা প্রয়োগ না-করলেও চলে।

সমুদ্রতল (sea-level) ঃ সমুদ্রতল বা গড় সমুদ্রতল বলতে বোঝায় সমুদ্রের মুক্ত তলের গড় উচ্চতা,—অবশ্যই নিস্তরঙ্গ অবস্থায়। যেহেতু সমুদ্রের বুকে সবচেয়ে বড় ঢেউগুলো সাধারণত জোয়ারেরই ঢেউ হয়ে থাকে, অতএব জ্যোতিষিক প্রভাব বর্জনের জন্য উনিশ বছরের জোয়ার-ভাঁটার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

সমুদ্রতলের দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণে দেখা যায়—সময়ের সঙ্গে এর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়ে থাকে বিক্ষিপ্তভাবে। কোথাও একটি বিশেষ উপকূলের সাপেক্ষে সমুদ্রতল উপরে উঠতে দেখা যায়, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে সমুদ্রতল 1930 থেকে 1950-এর ভিতর প্রতি বছর 0·25 ইঞ্চি উঠেছে। মেরু অঞ্চলের বরফের আংশিক গলন এর জন্য দায়ী। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় এর বিপরীত ঘটনা লক্ষ করা যায়। এখানে জমি উপরে উঠছে সমুদ্রতলের তুলনায়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়,—ভূতপূর্ব তুষার-যুগের সঞ্চিত বরফের চাপ থেকে এই সব দেশ ক্রমশ মুক্তি পাবার ফলেই পৃথিবীর গভীর স্তরের তরলে ভাসমান দেশগুলো হাল্কা হয়ে উপরে উঠছে। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চলমান দেশ'-তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।]

পলি-পাথর / পাললিক শিলা (sedimentary rock) ঃ সমুদ্রের তলায় থিতিয়ে পড়া বালি, কাদা, পাথরের টুকরো ইত্যাদির স্তর যথেষ্ট পুরু হবার পর অপেক্ষাকৃত নীচের স্তর জলের সংস্পর্শ হারায় এবং উপরের স্তরের দীর্ঘকালীন চাপে পাথরে পরিণত হয়। হ্রদ কিংবা নদীতেও এই ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

বেলেপাথর (sandstone), কাদা-পাথর (shale), চুনাপাথর (limestone), নুড়ি-খচিত পাথর (conglomerate) ইত্যাদি পলি-পাথরের নানা দৃষ্টান্ত। কয়লাও পলি-পাথর, তবে এর উৎস জৈব-উৎস।

পলি (silt) ঃ অধঃক্ষেপ—যা' সাধারণত নদী, সমুদ্র এবং হ্রদের নীচে জমা হয়। পলি-কণিকার ব্যাস সাধারণত 0·02 থেকে 0·002 মিলিমিটারের ভিতরেই ধরা হয় ; অর্থাৎ—পলি-কণিকা বালির চেয়ে সূক্ষ্ম, কিন্তু কাদার (clay-র) চেয়ে বড়।

প্রণালী (strait) ঃ সমুদ্রের একটি সংকীর্ণ অংশ—দু'টি বিস্তীর্ণ সাগর বা জলাশয়কে যা' সংযুক্ত করে। [৪নং ছবি দ্রষ্টব্য।] দু'টি নিকটবর্তী ভূমিভাগের (দেশের) মধ্য দিয়ে প্রণালীর জল প্রবাহিত হয়। বাংলায় 'প্রণালী'

শব্দটি ইংরেজি strait এবং channel—দু'টি শব্দেরই প্রতিশব্দ হিসাবে গণ্য, এবং বস্তুত ঐ দু'টি ইংরেজী শব্দের তাৎপর্য অভিন্ন। তবে, ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়—strait সংকীর্ণতর। 'প্রণালী' প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। কৃত্রিমভাবে তৈরী 'প্রণালী'কে সাধারণত 'খাল' (canal) বলা হয়।

তাপনতি-স্তর (thermocline)ঃ সমুদ্রের (বা হ্রদের) জলের যে স্তরে তাপমাত্রা গভীরতার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হয়—সেই স্তরকে 'তাপনতি-স্তর' বলা হয়। ['নতি' (gradient) = পরিবর্তনের হার।] এই স্তরের উপরের জল উষ্ণতর, এবং নীচের জল যথেষ্ট ঠাণ্ডা। সমুদ্রে সাধারণত দু'টি তাপনতি-স্তর থাকে। অল্প গভীরে একটি পরিবর্তনশীল স্তর এবং অপেক্ষাকৃত
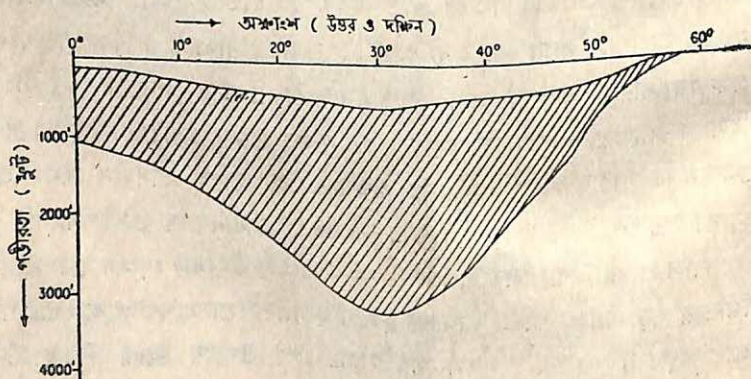
ছবি 12

স্থায়ী ঃ তাপনতি-স্তর

বেশী গভীরে একটি অপরিবর্তনীয় তাপনতি-স্তর। অপরিবর্তনীয় স্তরটির ঋতুগত পরিবর্তন বিশেষ হয় না ; কিন্তু, কত গভীরে এই স্তর থাকবে, এবং স্তরটির নিজস্ব গভীরতা (পুরুত্ব) কত হবে,—তা' অক্ষাংশের এবং দ্রাঘিমাংশের—বিশেষত, অক্ষাংশের—উপরে নির্ভর করে। 12 নং ছবিতে এটি দেখানো হয়েছে। বিষুবরেখা বরাবর এই স্থায়ী তাপনতি-স্তর অল্প গভীরেই অবস্থান করে, 25° থেকে 35° অক্ষরেখার ভিতরে এর অস্তিত্ব সবচেয়ে বেশী গভীরে হয়, এবং 55° থেকে 60° অক্ষরেখায় একেবারে মুক্ত তলে চ'লে আসে। [উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই গোলার্ধেই এই বর্ণনা প্রযোজ্য।]

স্থায়ী তাপনতি-স্তরের অস্তিত্বের সহজ ব্যাখ্যাও সংক্ষেপে দেওয়া যেতে পারে।

—উত্তর এবং দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের অত্যন্ত ঠাণ্ডা জল তখন যথাক্রমে দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়, তখন অপেক্ষাকৃত বেশী ঘনত্বর জন্য ক্রমশই উষ্ণতর জলের নীচে চ'লে যায়, এবং এর ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণতর জলের কিছু অংশের স্থানচ্যুতি ঘটে,—অর্থাৎ—নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে দূরে চ'লে যায়। এইভাবে, নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে অনেক দূর অবধি (উত্তর এবং দক্ষিণ—দু-দিকেই) সমুদ্রে দু'টি জল-স্তর থাকে,—উপরে উষ্ণতর স্তর, নীচে শীতল স্তর। দু'টি স্তরই চলমান—সব সময়ে; সুতরাং, মিশ্রণের ফলে উষ্ণতার বৈষম্য ঘুচে যাবার তেমন সুযোগ হয় না। তবে, উল্লিখিত দুই স্তরের সংযোগ-তল বরাবর—যেখানে তাপ-বিনিময় কিছুটা ঘটে, সেখানে স্থায়ী তাপনতি-স্তর গ'ড়ে ওঠে। এখানে তাই গভীরতার সঙ্গে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত দ্রুতহারে।

স্থিরপথ বায়ু (trade winds) ঃ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চ-চাপ বলয় ['অশ্বাক্ষ বলয়' দ্রষ্টব্য।] থেকে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ-বলয় অভিমুখী পৃথিবী-তলস্পর্শী বাতাস। [ঊর্ধ্বস্তরে এর বিপরীতমুখী বাতাস লক্ষণীয়; এর নাম 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু'। 'স্থিরপথ প্রতিবায়ু' দ্রষ্টব্য।] উত্তর গোলার্ধে এই বাতাস উত্তর-পূর্ব দিক থেকে, এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসে। [ছবি ঃ 7 দ্রষ্টব্য।] এই বাতাস প্রধানত শুষ্ক; বিশেষত নিরক্ষ-অঞ্চল থেকে দূরবর্তী জায়গায়।

এই বাতাসের স্রোত মূলত সম্পূর্ণ স্রোত-বৃত্তের অংশ। নিরক্ষ অঞ্চলে দুই গোলার্ধের 'স্থিরপথ বায়ু' ঊর্ধ্ব স্তরে ওঠে, এবং স্থিরপথ প্রতিবায়ু হিসাবে দুই গোলার্ধে দুই অভিমুখে ধাবিত হয়। ঊর্ধ্ব স্তরে এই বাতাস ওঠার দরুন ঠাণ্ডা হয় এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলটি নিম্ন-চাপের অঞ্চল হিসাবেও চিহ্নিত হয় (বাতাসের ঊর্ধ্বগামিতার দরুন)। ঊর্ধ্বস্তরের ঐ প্রতিবায়ু দুই গোলার্ধের দুই 'অশ্বাক্ষ' বরাবর নীচে নামে, এবং ঐ দুটি অঞ্চলকে উচ্চ-চাপের অঞ্চল হিসাবেও চিহ্নিত করে। জলহীনতার কারণে এই বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক হয়, এবং যে অঞ্চলে পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে, সেই সব অঞ্চলে মরুভূমির জন্ম হয়। এই বাতাস এইবার নিরক্ষ-অঞ্চলগামী বাতাস; এবং 'স্থিরপথ বায়ু' নামে পরিচিত হয়।...পুরোনো সামুদ্রিক পরিভাষায় 'to blow trade'-এর অর্থ 'অপরিবর্তনশীল পথে প্রবাহিত হওয়া'। বস্তুত, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ঐ নামকরণ।

গহ্বর (trench / trough) ঃ সমুদ্রের তলদেশের অতি গভীর ও দীর্ঘায়ত পরিখা, যা' সাধারণত সমুদ্রের সচল তলদেশের জন্য পৃথিবীর গভীরে প্রবেশের পথ। এই 'গহ্বর' সাধারণত মধ্য-সমুদ্রের কাছে দেখা যায় না ; সমুদ্রের প্রান্তে বা সীমানার কাছে অবস্থান করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[এখানে আলোচিত বিষয়গুলো সমুদ্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনার কথা ভেবে নির্বাচিত হয়েছে। গভীরতর অধ্যয়নের সময়ে এই বিজ্ঞানও নানা শাখা বিস্তার করে, এবং এক-একটি শাখায় এক-এক ধরণের শব্দ-সম্ভার প্রয়ো ন হয়। আগ্রহী পাঠক অধিকাংশ প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ ৯৯ পৃষ্ঠায় নির্দেশিত

'Mc Graw-Hill Encyclopedia of Ocean & Atmospheric Sciences'এ পেতে পারেন।]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমুদ্র সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে [সমুদ্রের তলা, সমুদ্রের স্রোত, বিবর্তন ইত্যাদি] প্রামাণিক আলোচনার জন্য সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

Encyclopoedia Britannica [15th Ed.]

McGraw-Hill Encyclopedia of Ocean & Atmospheric Sciences [1980]

Scientific American [September ; 1969]

এইসঙ্গে আরও দু'টি নাম যুক্ত করা যায় ঃ

Encyclopedia Americana [1980]

Marvels and Mysteries of the World Around Us— [Reader's Digest Publication, 1972]

'El Nino' সম্পর্কে সামগ্রিক এবং সচিত্র আলোচনা ঃ

'El Nino's Ill Wind'—T. Y. Canby [National Geographic Magazine ; Feb, 1984]

আটলান্টিস প্রসঙ্গে তিনটি বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

Lost Atlantis—J. Bramwell [Harper & Bros., 1938]

The History of Atlantis—L. Spence [University Books, 1968]

Atlantis—E. S. Ramage [Indiana University Press, 1978]

মারিয়ানা ট্রেঞ্চে অবতরণের বর্ণনাটি ঐ বছরেই 'LIFE' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

We Made World's Deepest Dive—Don Walsh.

Continental Drift-এর প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

Continental Drift—Tarling & Tarling [Penguin, 1972]

Continents in Motion—W. Sullivan [McMillan, 1974]

বাংলায় বর্তমান লেখকের একটি পুস্তিকা আছে ঃ

'চলমান দেশ' [ফার্মা কে এল্ এম্, 1981]

শক্তির উৎস হিসেবে সমুদ্র সম্প্রতি বহু বই-এর আলোচনার বিষয়। এই চারটি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

Energy, Earth & Everyone—M. Gabel
[Anchor Books, 1980]
Earth, Water, Wind and Sun
—D. S. Hallacy, Jr. [Harper & Raw, 1977]
McGraw-Hill Encyclopedia of Energy [1976]
Energy, Ecology, Economy—G. Garvey
[W. W. Norton & Co., 1972]

শেষের বইটিতে সমুদ্রদূষণ সম্পর্কেও কিছু আলোচনা আছে।

সমুদ্রদূষণের বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

Neptune's Revenge—Anne W. Simon
[Franklin Watts, 1984]

উপকূলবর্তী সমুদ্রের জন্য বিশেষ আলোচনা ঃ

The Water's Edge—B. H. Ketchum (Ed.)
[M I T Press, 1972]

খাদ্যের উৎস হিসেবে সমুদ্র সুন্দর এবং বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে এই বইতে ঃ

The Sea Against Hunger—C. P. Idyll.
[T. Y. Crowell Co., 1978]

পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল আলোচনার জন্য উল্লেখযোগ্য ঃ

Food From the Sea—F. W. Bell [Westview Press, 1978]

শুদ্ধিপত্র
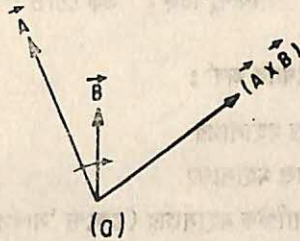
ছবি ঃ 6 (a)

৩৩ নং পৃষ্ঠায় 6 নং ছবির (a)-অংশ ভ্রমক্রমে বাদ গিয়েছে। এইখানে ঐ অংশটি মুদ্রিত হ'ল।

চিত্র-4 পরিচিতি

তরঙ্গ-চিহ্ন ঃ শীতল স্রোত

বিন্দু-চিহ্ন ঃ উষ্ণ স্রোত

ছবিতে ব্যবহৃত সংখ্যার অর্থ ঃ

1. উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর
2. দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর
3. উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর (কেন্দ্রে 'সারগাসো সমুদ্র')
4. দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর
5. ভারত মহাসাগর
6. গালফ্ স্ট্রীম্ (Gulf Stream)
7. ক্যারিবিয়ান্ স্রোত (Caribbean Current)
8. বেঙ্গুয়েলা স্রোত (Benguela Current)
9. পেরু স্রোত (Peru Current)
10. নিরক্ষীয় প্রতিস্রোতসমূহ (Equatorial Countercurrents)
11. দক্ষিণ-মেরু সীমান্তবর্তী স্রোত (Antarctic Circumpolar Current)
12. লাব্রাডর্ স্রোত (Labrador Current)
13. ক্যানারি স্রোত (Canary Current)
14. উত্তর আটলাণ্টিক স্রোত (North Atlantic Current)
15. কুরোশিও স্রোত (Kuroshio Current)

এশিয়া
15
1
10
অস্ট্রেলিয়া
11
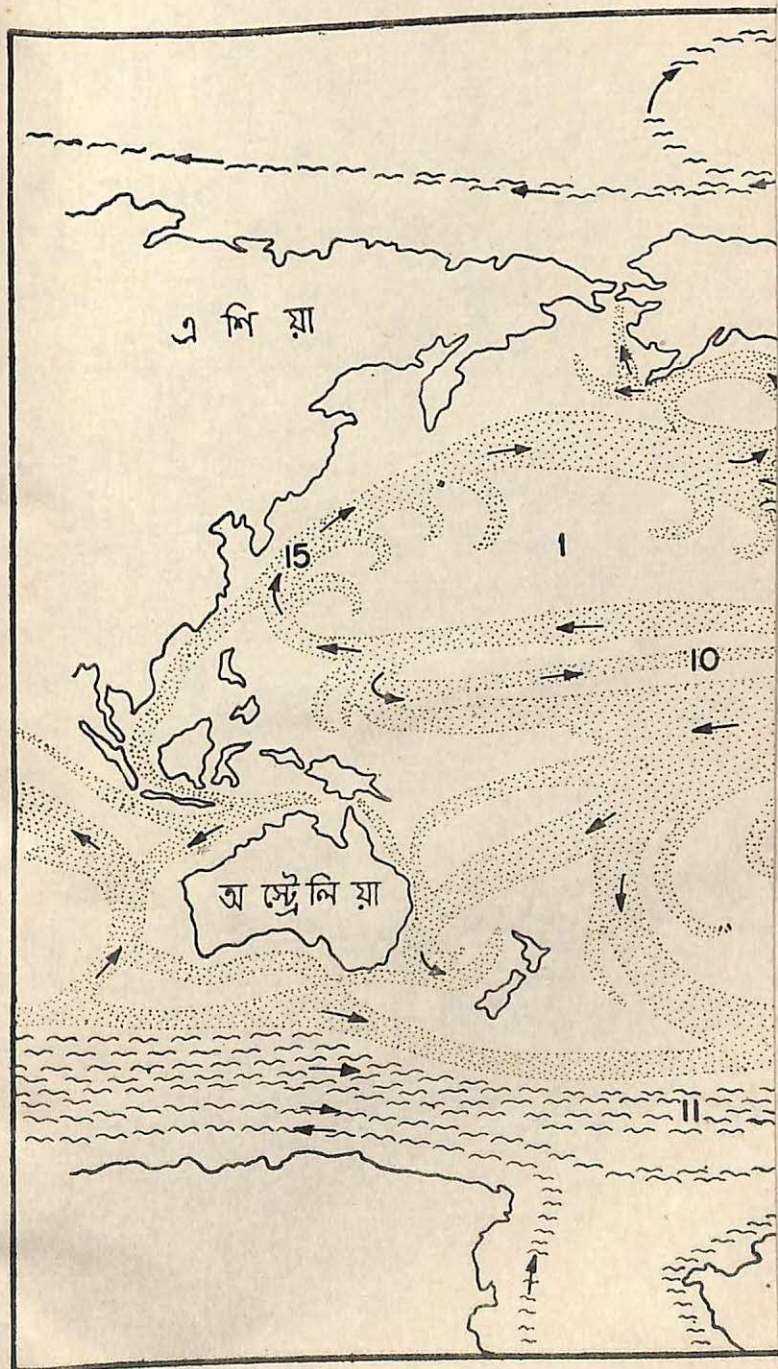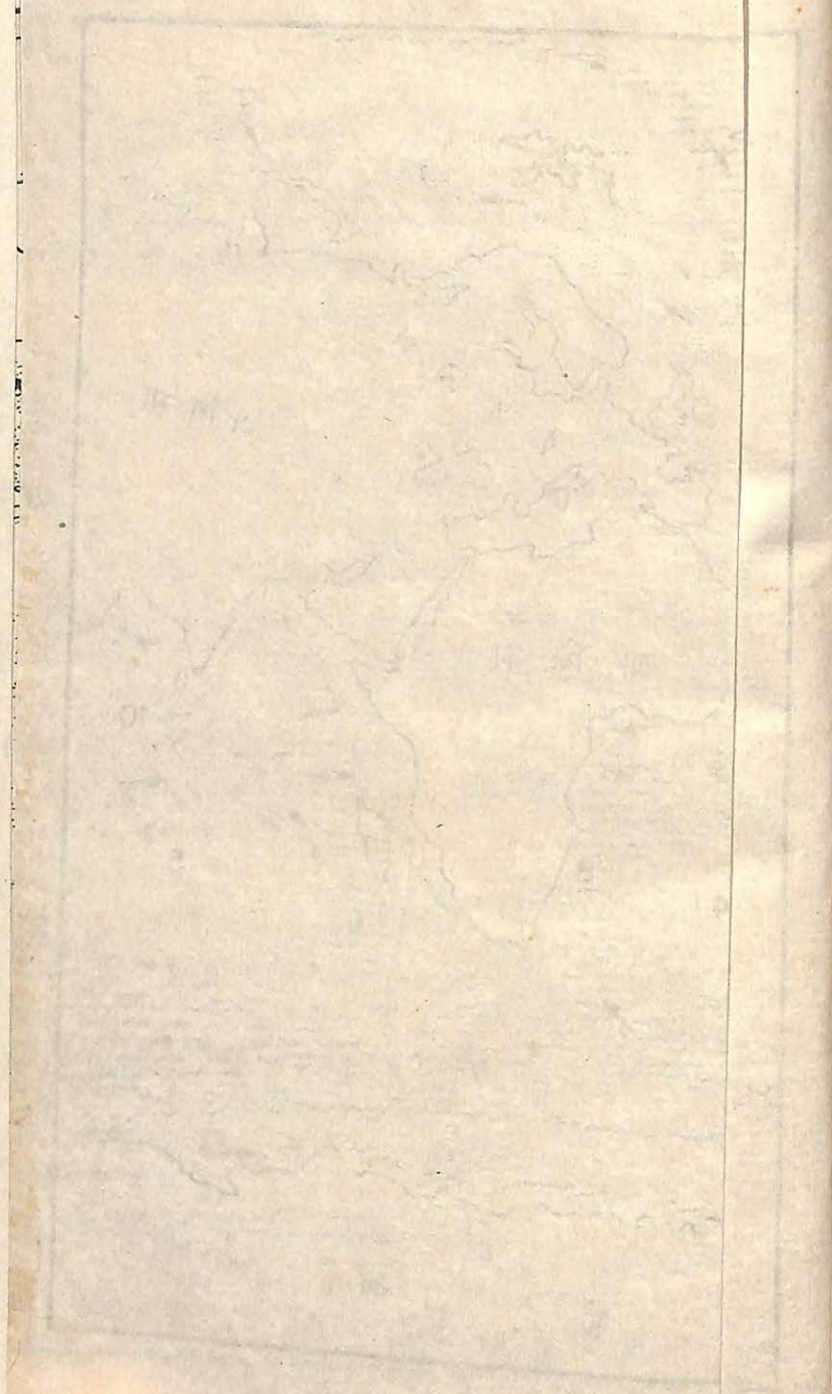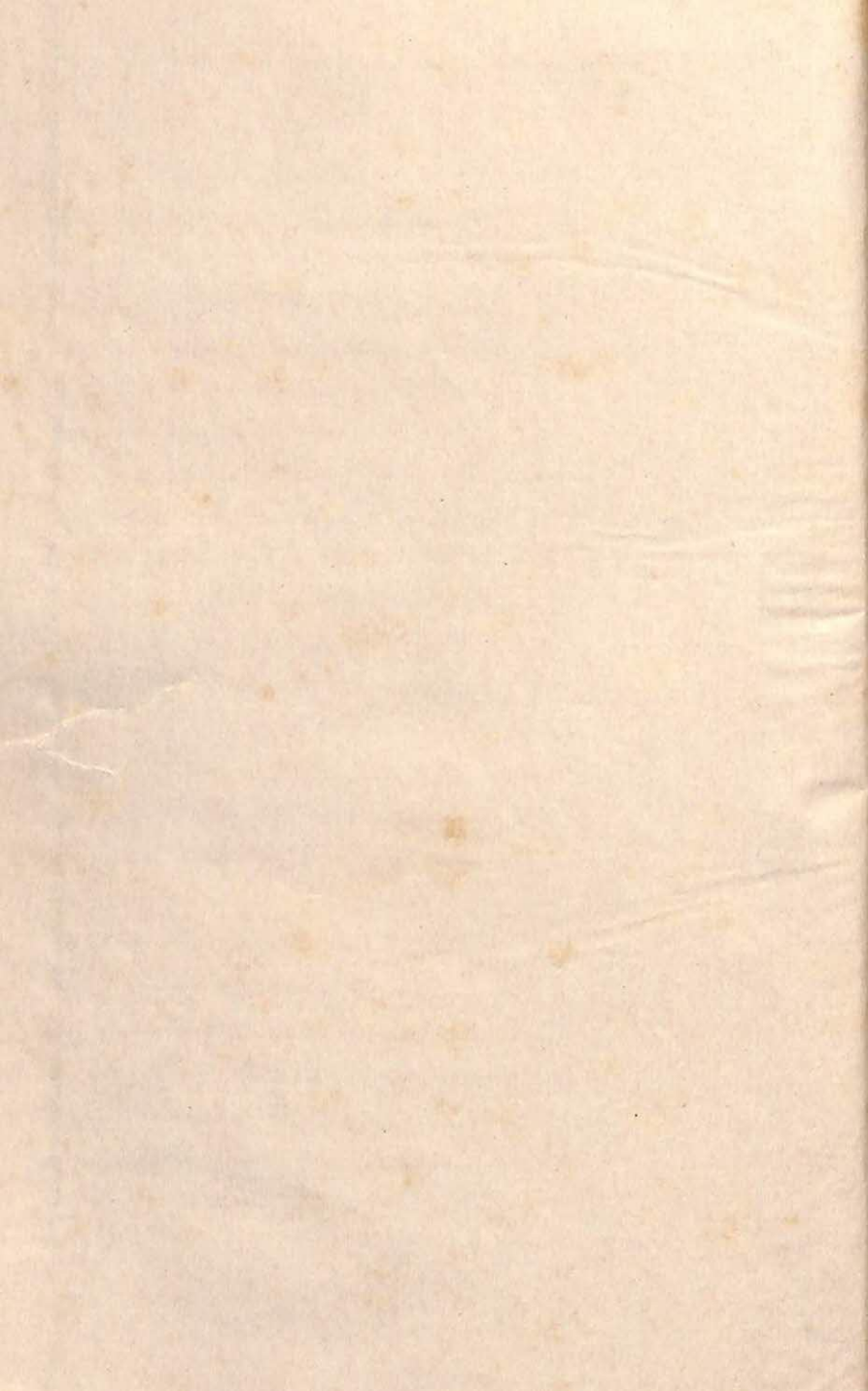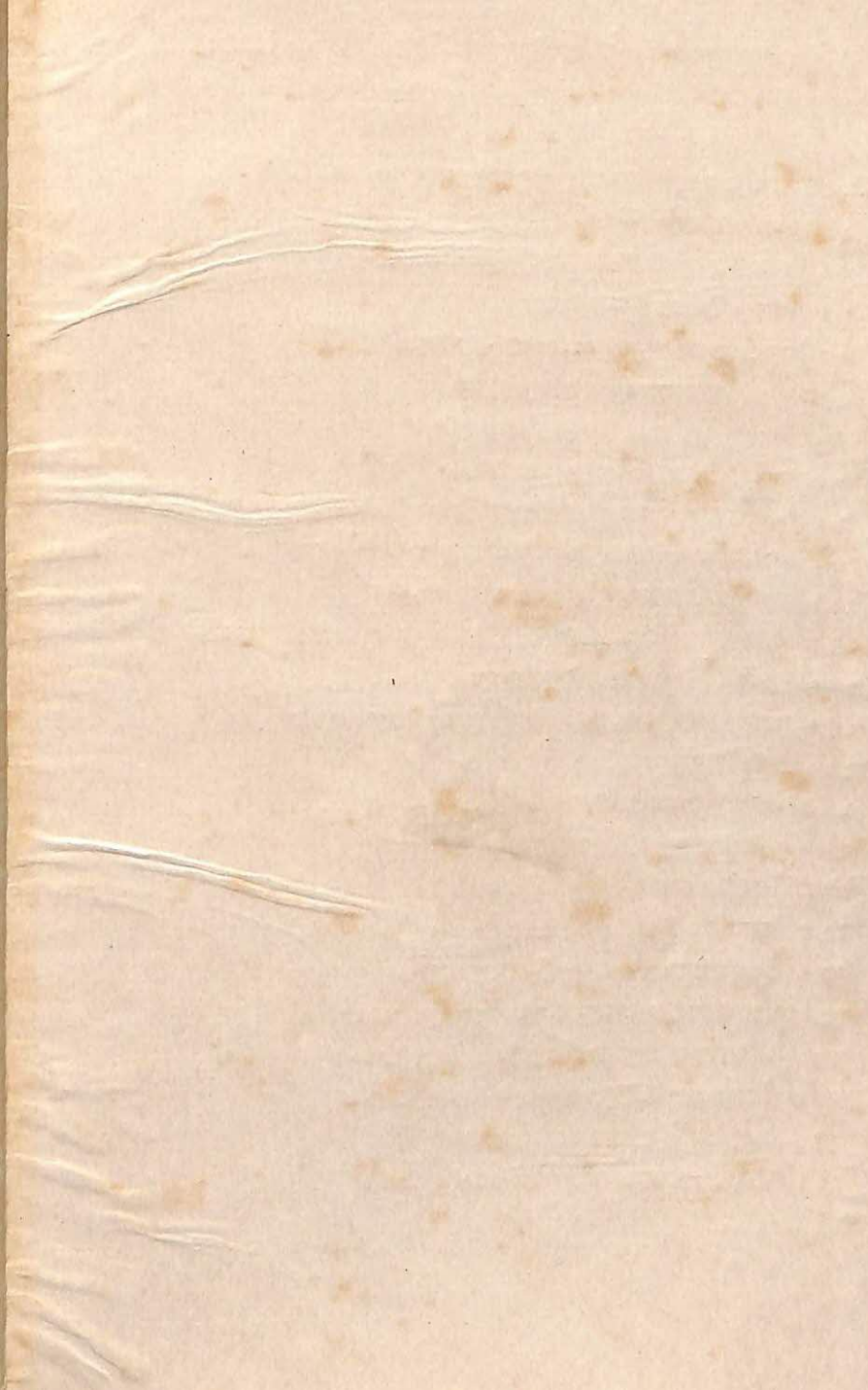
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিষেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০
৮। হাঁপানি রোগ/মনীশচন্দ্র প্রধান/৪·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহীততত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবক্সী/৯·০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সঙ্কর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
২৩। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ/বলাইলাল জানা
২৫। আবহাওয়া ও আমরা/অপরাজিত বসু/১০·০০

আট টাকা